গল্প বলি গল্প শোনো

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

অ শো ক প্র কা শ ন
কলিকাতা বারো

উপেন্দ্রকিশোর জন্মেছিলেন, একশ বছরেরও আগে। বাঙলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যে তাঁর অবদান আজও অতুলনীয়। ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, মহাভারতের গল্প, ছোট্ট রামায়ণ, টুনটুনির বই, সেকালের কথা প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত বই। উপেন্দ্র-কিশোর অসংখ্য গল্প লিখেছেন। সে সব গল্প সংগ্রহ করে প্রকাশ হয়েছে অল্প কিছুকাল আগে! তা-ও অসম্পূর্ণ, সমস্ত গল্প একটি খণ্ডে প্রকাশ করতে গেলে বিরাট আকার ধারণ করবে। যে গল্পগুলি সব থেকে আশ্চর্যনীয়, আর যার মধ্যে বিচিত্র স্বাদের পরিচয় রয়েছে, তেমনি কয়েকটি গল্প এই সংগ্রহে স্থান দেওয়া হয়েছে। একালের পাঠক এর মধ্য থেকে মনের মত আনন্দ উপাদান পাবেন বলেই বিশ্বাস।

গল্প বলি গল্প শোনো

এতে আছে

গুপি গাইন ও বাঘাবাইন

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির ক'রে বলত 'গুপি গাইন'।

গুপি যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব ক'রেই গাইত; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে ব'সে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চ'লে গেল; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব ক'রে গান ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচোত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ করে থাকত আর বলত, 'আহা! আ-া-া!! অ-অ-অ-হ্-হ্-হ্!!! শেষে যখন 'হাঃ, হাঃ, হা-হা!' ব'লে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে প'ড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন।' তার এই বাঘা নামই রটে গিয়েছিল; আসল নাম যে তার কী, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা ক'রে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পার, না-হয় আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পয়সাটা দিই। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে!' শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা ক'রে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যারপরনাই খুশী হয়ে বললে, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিনকতক এইভাবে চললে কী হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বললে, 'লক্ষ্মী,

দাদা। তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চ'লে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!'

বাঘা আর কী করে? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দুদিন না থাকতে থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার ক'রে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় ক'রে বলে 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না। আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, 'আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চ'লে যাওয়াই ভাল। না-হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে!' এই বলে বাঘা তার ঢোলটিকে ঘাড়ে ক'রে বনে চ'লে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ্-ভালুক কিছু নেই। আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায় নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো। ওটা এলেই তো ঢোলক-সুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু কেউ নয়, সে গুপি গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপির গলা ভাঁজা! গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মত ভয়ে কাঁপে! শেষে একটু ভাবল, 'এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।' এই ভেবে গুপি চুপিচুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর-একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় ক'রে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে?'

বাঘা বললে, 'আমি বাঘা বাইন, তুমি কে ?'

গুপি বললে, 'আমি গুপি গাইন। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

বাঘা বললে, 'যেখানে জায়গা জোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গানবাজনা বোঝে না, তাই ঢোলটি নিয়ে বনে চ'লে এসেছিলাম। তা ভাই, এখানে যে ভয়ংকর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।'

গুপি বললে, 'তাই তো! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বলো তো তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় ব'সে ডাকতে শুনেছিলে ?'

বাঘা বললে, 'বনের পূর্বধারে, বটগাছের তলায়।

গুপি বললে, 'আচ্ছা, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে হরতুকীতলায় ব'সে।'

বাঘা বললে, 'সে তো আমার ঢোলকের আওয়াজ, আমি যে ঐখানে থাকতাম।'

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান

আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপি বললে, 'ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দুজনে জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করিতে পারি।'

এ কথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে, তারা দুজনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে, রাজামশাই যে তাতে খুব খুশী হবেন, তাতে তো আর ভুলই নেই, চাই কি অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

গুপির আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শুনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল; সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়। বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে! তারা বলল, 'ভাই, আমাদের কাছে তো পয়সা-টয়সা নেই, আমরা না-হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব, আমাদের পার ক'রে দাও।' তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুশী হয়ে নেয়েকে বলল, 'আমরা চাঁদা ক'রে এদের পয়সা দেব, তুমি এদের তুলে নাও।'

বাঘার ঢোলটি দেখেই নেয়েরও বাজানা শুনতে ভারি সাধ হয়েছিল, কাজেই সে এক কথায় আর কোন আপত্তি করল না। গুপিকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকো-ভরা লোক, ব'সে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকাও নদীর মাঝ-খানে এসে পড়ল। তারপর খানিক একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকোসুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি ক'রে দিল নৌকো-খানাকে উল্‌টে।

তখন তো আর বিপদের অন্তই নেই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধ'রে দুজনার প্রাণরক্ষা হল। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না! তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে
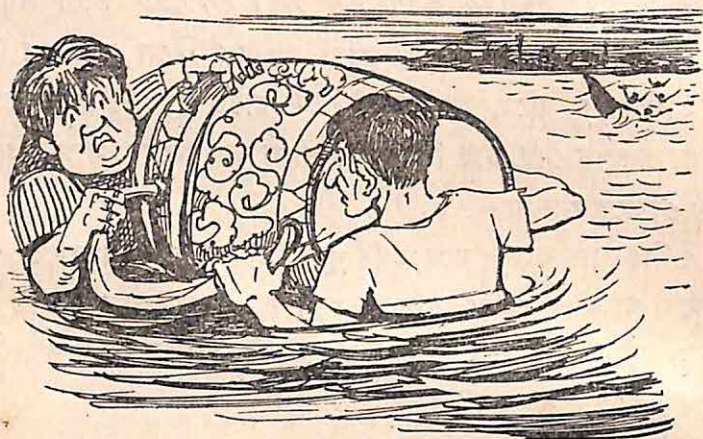
কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রির তো আর কথাই নেই! তখন বাঘা বলল, 'গুপিদা, বড়ই তো বিষম দেখছি! এখন কী করি বলো তো।' গুপি বলল, 'করব আর কী? আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?'

বাঘা বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা! মরতে হয় তো ওস্তাদ লোকের মত মরি, পাড়াগেঁয়ে ভূতের মত মরতে রাজী নই।'

এই ব'লে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজনা শুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজা ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যারপরনাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কী জমাট হয়েছিল, সে আর কী বলব? এক ঘণ্টা দুঘণ্টা ক'রে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল, যেন চারদিকে একটা কী কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কী যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে; তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মূলোর সার।
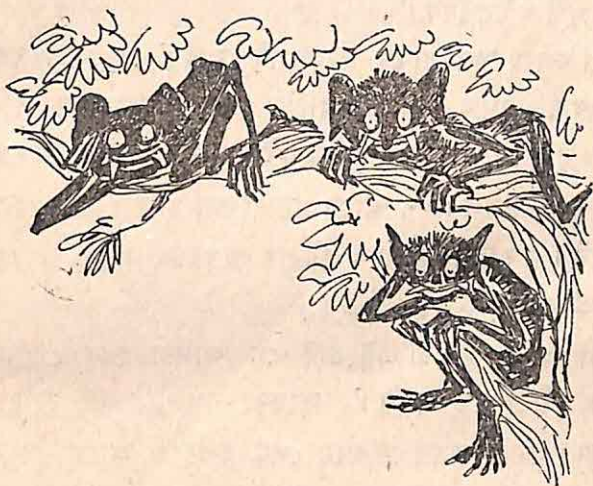
তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাত-পা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে ঘাড় ব'সে, চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ ক'রে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠকঠকি ধ'রে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবারও জো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গাজবাজনা শুনে ভারি খুশী হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপির আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকিসুরে বলল, 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!'

এ কথায় গুপির আর বাঘার একটু সাহস হল; তারা ভাবল, 'এ তো মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি না।' এই ব'লে যেই তারা আবার গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন ক'রে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কী কাণ্ডকারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার

জো আছে! গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমজদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে তো আর ভূতদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল, 'চল্ বাবা মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুশী ক'রে দিব।'

গুপি বলল, 'আমরা যে রাজবাড়ি যাব!' ভূতেরা বলল, 'সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ি একটু গানবাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুশী করে দিব!' কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতদের বাড়ি চলল। সেখানে গানবাজনা যা হল, সে আর ব'লে কাজ নেই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বলল, 'তোরা কী চাস?'

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশী করতে পারি।' ভূতেরা বলল, 'তাই হবে, তোদের গানবাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কী চাস?'

গুপি বলল, 'আর এই চাই যে আমাদের যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়।' একথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বলল, 'তোরা

যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কী চাস?'

গুপি বলল, 'আর কী চাইব, তা তো বুঝতে পারছি না।' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দুজোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল, 'এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।'

তখন তো আর কোনো ভাবনাই রইল না। গুপি আর বাঘা ভূতদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতো পায়ে দিয়েই বলল, 'তবে আমরা এখন রাজবাড়ি যাব!' অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; গুপি আর বাঘ দেখল, তারা দুজনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে! এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ি তারা তাদের জীবনে কখনো দেখে নি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ি।

কিন্তু এর মধ্যে ভারি একটা মুশকিল হল। রাজবাড়ির ফটকে যমদূতের মত কতকগুলো দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপি আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'এইয়ো! কাঁহা যাতা হ্যায়?' গুপি থতমত খেয়ে বলল, 'বাবা, আমরা রাজা মশাইকে গান শোনাতে এসেছি।' তাতে দারোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বলল, 'ভাগো, হিঁয়াসে।' গুপিও তখন নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'ইস্! আমরা তো রাজার কাছে যাবই।' বলতেই অমনি সেই জুতোর গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাজামশায়ের সামনে উপস্থিত হল।

রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজা মহাশয় ঘুমিয়ে আছেন, রানী তাঁর মাথার কাছে ব'সে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, গুপি আর বাঘা সেই সর্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হল। জুতোর এমনি গুণ, দরজা জানালা সব বন্ধ হয়ে রয়েছে, তাতে তাদের একটুও আটকায় নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক, আর নাই আটকাক, আসবার পরে খুবই আটকাল। রানী তাদের

দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চিৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন ; রাজামশাই লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন ; রাজবাড়িময় হুলস্থূল পড়ে গেল। সিপাই সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেখে গুপি আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে, 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চ'লে যাব', তবেই তাদের জুতোর গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু-পা যেতে না যেতেই বেচারারা মারটা যে খেল! জুতো, লাঠি, চাবুক, কিল, চড়, কানমলা,—কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'বেটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখো। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

হায় গুপি ! হায় বাঘা ! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকশিশ পাবে ভেবে তার মধ্যে এ কী বিপদ ? পেয়াদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে প'ড়ে বেচারারা একদিন আর গায়ের ব্যথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার ঢোলটি যে গেল সেই হল সর্বনাশের কথা ! বাঘা বুক মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছে, আর বলছে, 'ও গুপিদা।—ওঃ-ওঃ-হ-হ-হ-হ অ-অ ! আরে ও গুপিদা ! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু দাদা, আমার ঢোলকটি যে গেল !'

গুপির কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে বাঘার গায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় কী দাদা ? ঢোল গিয়েছে, জুতো আর থলে তো আছে। আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটু মজা ক'রে নিতে হবে।' বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, 'কী মজা করবে দাদা ?' গুপি বলল, 'আগে তো খাবার মজাটা ক'রে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখব এখন।'

এই ব'লে সে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিয়ে বলল, 'দাও তো দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও।' অমনি একটা সুগন্ধ বেরুল! তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কী বিশাল হাঁড়ি। গুপি কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক, কোন মতে সেটাকে বার ক'রে এনে তারপর থলিকে বলল, 'ভাজা, ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, শরবত। —শিগ্গির শিগগির দাও।' দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনারুপোর বাসনে ঘর ভ'রে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চ'লে গেল তার আর ঠিক নেই।

তখন বাঘা বলল, 'দাদা, চলো এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।' গুপি বলল, 'পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতো থাকতেই কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক-না, কী হয়।' এ কথায় বাঘা খুব খুশী হল; সে বুঝতে পারল যে, গুপিদা একটা-কিছু মজা করবে।

দু দিন চ'লে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপি থলের ভিতর হাত দিয়ে বলল, 'আমাদের দুজনের রাজপোষাক চাই।' বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোশাক বেরুল যে তেমন পোশাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোশাক তারা দুজনে প'রে, তাদের পুরনো কাপড় আর বাসন কখানি পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে, জুতো পায় দিয়ে তারা বলল, 'এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।' অমনি দেখে, রাজবাড়ির বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চ'লে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটুলিটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে এসে রাজ-বাড়ির সামনে উপস্থিত হল।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, 'মহারাজ, দুজন রাজা আসছেন।' রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাঘা আর গুপি

আসতেই তিনি তাদের যারপরনাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পেয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল, তার অন্ত নেই।

তারপর গুপি আর বাঘা হাত-প্া ধুয়ে জলযোগ ক'রে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোশাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, 'না-জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন।' তারপর শেষে যখন তিনি গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আপনারা কোন্ দেশের রাজা?' তখন গুপি হাত জোড় ক'রে তাঁকে বলল, 'মহারাজ! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!'

গুপি সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, 'কী ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি।' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সেদিন সে দুটো লোকের বিচার হবে—তিন দিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত আসামী দুটোকে আনতে পেয়াদা গিয়াছে; কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেউ নেই, খালি ঘর পড়ে আছে।

তখন তো ভারি একটা ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল। দারোগামশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পেয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পেয়াদারা হাত জোড় করে বলল, 'হুজুর! আমাদের কোনো কসুর নেই; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও দুটো তো মানুষ ছিল না, ও দুটো ছিল ভূত; নইলে এর ভিতর থেকে কী করে পালাল?'

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল। রাজামশাইও প্রথমে দারোগার

উপর রেগে তাঁকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক, ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও তো বন্ধ ছিল, তার ভিতর এত বড় ঢোল নিয়ে কী করে ঢুকেছিল ?'

তা শুনে সকলেই বলল, 'হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!' বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলকটির কথা মনে করে বলল, 'মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।'

রাজামশাইও বললেন, 'বাপ রে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব ? এক্ষুনি ওটাকে এনে পোড়াও!'

যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দু-হাতে চোখ ঢেকে 'হাউ হাউ হাউ' করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

সেদিন বাঘাকে নিয়ে গুপির কী মুশকিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘ কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না-জানি সে কী করবে। তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে ? কী সর্বনাশ! এখন বুঝি ধরা পড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপির বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার তো আর জো নেই; সভায় বসবার সময় যে সেই জুতোগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলুস্থুল পড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারী অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ির বদ্যিঠাকুর এসে বাঘার নাড়ী দেখে যারপর নাই গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বদ্যিঠাকুর বললেন যে, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর-একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে ভাবল যে, বদ্যিঠাকুর কী চমৎকার ওষুধই দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা পড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল। রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন ; গুপি তার কাছে বসে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল, 'ছি, ভাই, যেখানে-সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে? দেখ দেখি, এখন কি মুশকিলটা হল।' বাঘা বলল, 'আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে তো এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ করে দিত। এখন না-হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা তো বেঁচে গেছে!'

বাঘা আর গুপি এমনি কথাবার্তা বলছে। এদিকে রাজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তাঁর কানে কানে বললেন, 'মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় তো বলি।' রাজা বললেন, 'কী

কথা?' দারোগা বললেন, 'মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা, সেই দুই ভূত; আমি তাদের চিনতে পেরেছি।' রাজা বললেন, 'তাই তো হে, আমারও একটু যেন সেইরকমই ঠেকছিল। তাহলে তো বড় মুশকিল দেখছি। বলো তো এখন কী করা যায়?'

তখন একথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারি একটা কানাকানি শুরু হল। কেউ বলল, 'রোজা ডাকো, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক। আর একজন বলল, 'রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন তো সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।'

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এর মধ্যে একটু মুশকিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও তখন আগুন ধরে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগানবাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হবে; বাগানবাড়ি পোড়া গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। তখন রাজামশাই বললেন যে, 'সেই ঢোলকটাকেও তাহলে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখা যাক; বাগানবাড়ি পোড়াবার সময় একসঙ্গে সকল আপদও চুকে যাবে।'

বাগানবাড়ি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশী হল। তারা তো জানে না যে এর ভিতরে কী ভয়ানক ফন্দি রয়েছে; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সংগীতচর্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়িটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপি তাকে বলল, 'ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কী? চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।' বাঘা বলল, 'দাদা, এমন সুন্দর যায়গায় তো আর থাকতে পাব না, দুদিন এখানে রইলাম বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত!'

সে দিন বাঘা বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের

এক জায়গায় বসে গুনগুন করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চেঁচামেচি করে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি 'ও গুপিদা! ও গুপিদা!' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপি তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলকটা মাথায় করে পাগলের মত নাচছে, তার যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে 'গুপিদা গুপিদা' বলে চেঁচাচ্ছে। ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে, সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল, 'গুপিদা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি—আর কী মজা—হাঃ হাঃ হাঃ' বলে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বলল, 'দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নি।' গুপি বলল, 'এখন নয় ভাই, এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় বসে দুজনায় খুব করে গানবাজনা করা যাবে।'

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যায় সময় সেই বাগানবাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগা-মশায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন, খাওয়াদাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেই কাঠের বাড়ির চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভালমতই হল। গুপি আর বাঘা ভাবল যে লোকজন চলে গেলেই তারা গানবাজনা আরম্ভ করবে, দারোগা-মশাই ভাবলেন যে গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তারা না ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল যে লোকজন সব চ'লে গেছে, আর কারু সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর-একটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুড়ে দিল।

এদিকে দারোগামশাই তাঁর লোকদের বলে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল করে আগুন ধরাবি; খবরদার, আগুন ভাল করে না ধরলে চলে যাস নি যেন!' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভাল মতই ধরেছে দারোগা-

মশাই ভাবছেন 'এই বেলা ছুটে পালাই' এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপিও গান ধরে দিল। তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখানে থেকে নড়বার জো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতোর জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই তো পুড়ে মারা গিয়াছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচেছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আর দু-চারজন লোক রাজসভায় এসে বলল যে, তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সেখানে গিয়েছিল; তারা তখন ভারি আশ্চর্য রকমের গানবাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে

পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি! সেদিন তাঁর সভা করা হল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ির কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা-বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বলল, 'গুপিদা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল?' গুপি বলল, 'হাঁ!' বাঘা বলল, 'তবে এমন জায়গায় এসে কি, একটু গানবাজনা না করে চলে যেতে আছে?' গুপি বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই। তবে আর দেরি কেন? এই বেলা আরম্ভ করে দাও।' এই বলে তারা প্রাণ খুলে গানবাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছে। এক দল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলে ছুটিকে সুদ্ধ চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণ-পণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না। গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলোও সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে তো আর তার শেষ অবধি না শুনে চ'লে যাবার জো নেই; কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গানবাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধ'রে ফেললেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন, তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজ-কুমারেরাও বললেন, 'বাবা, এমন আশ্চর্য গান আর কখ্খনো শোন নি; এদের সঙ্গে নিয়ে চলো।' কাজেই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে চলো! তোমাদের পাঁচশো টাকা ক'রে মাইনে হল।'

এ কথায় গুপি জোড়হাতে রাজামশাইকে নমস্কার ক'রে বলল, 'মহারাজ, দয়া ক'রে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতামাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।' রাজা বললেন, 'আচ্ছা, এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি; তোমরা তোমাদের মা-বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।'

গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মেলে নি। তার মা-বাপ এর কয়েক-দিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় ক'রে আসতে দেখেই বলল, 'ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে; মার বেটাকে!' বাঘা বিনয় ক'রে বলল, 'আমি খালি আমার মা-বাবাকে দেখতে এসেছি; দুদিন থেকেই চ'লে যাব, বাজাব-টাজাব না।' সে কথা কি তারা শোনে? তারা দাঁত খিঁচিয়ে তার মা-বাপের মৃত্যুর কথা ব'লে এই বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপ্রণে ছুটে পালাতে পালাতে ইট মেরে তার পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি ক'রে দিল।

গুপি তাদের ঘরের দাওয়ায় ব'সে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে; তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? তোমার এ দশা কেন?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি! মূর্খগুলো আর একটু হলেই আমার ঢোলটি ভেঙে দিয়েছিল!' গুপিদের বাড়ি এসে গুপির যত্নে আর তার মা-বাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পরে গুপি তার মা-বাপের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ব'লে গেল,

'তোমরা তয়ের হয়ে থাকবে ; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

তারপর কয়েক মাস চ'লে গিয়েছে। গুপি আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে। দেশ বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে—'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি, হবেও না।' রাজামশাই তাদের ভারি ভালবাসেন ; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ সুখের কথা সব গুপির কাছে বলেন। একদিন গুপি দেখল রাজামশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কী ভাবছেন, যেন তাঁর কোনো বিপদ হয়েছে। শেষে একবার তিনি গুপিকে বললেন, 'গুপি, বড় মুশকিলে পড়েছি, কী হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।'

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজামশাইকে বলল, 'মহারাজ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড ক'রে দেব।' রাজা হেসে বললেন, 'গুপি, তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারী ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি ?' গুপি বলল, 'মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ক্ষতি তো কিছু হবে না।' রাজা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।' এ কথায় গুপি যারপরনাই খুশী হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপি আর বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধ'রে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ! সে বলল, 'দাদা, এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে ; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়, তবে হয়তো আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কষে ছুট দিতে

যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি ক'রে দেখ-না সেবারে আমাদের গাঁয়ে মূর্খ গুলোর হাতে আমার কী দশা হ'ল !'

যা হোক, গুপির কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিনকতক ধ'রে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চ'লে যায়, আর রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ংকর ; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই। রাজার ঠাকুর-বাড়িতে রোজ মহাধুমধামে পুজো হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পুজো দিয়ে, ঠাকুরকে খুশী ক'রে তারা হাল্লায় রওনা হবে।

গুপি আর বাঘা এর সবই দেখল, তারপর একদিন তাদের ঘরে ব'সে, দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বলল, 'নূতন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেস।' সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমনি মিঠাই কেউ খায় নি, চোখেও দেখে নি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি শুণ্ডীর রাজার ঠাকুর-বাড়ির বিশাল মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বসল। নীচে খুব পুজোর ধূম —ধূপধুনো শঙ্খঘণ্টা কোলাহলের সীমা নেই, আঙিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ ক'রে মিঠাই-গুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের চুড়ো আঁকড়ে ব'সে তামাশা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপধুনো আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর ছ চারজন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুঁজে তার একটু মুখে পুরে দিল ; দিয়েই আর কথাবার্তা নেই—সে দুহাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহ্লাদে চেঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙিনা-সুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলেছে যে, 'মহারাজ! ঠাকুর আজ পুজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কী অপূর্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।' সে কথা শুনবামাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে উর্ধ্ব-শ্বাসে এসে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠোন ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের কী অন্যায়। পুজো করি আমি, আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না! তোমাদের সকলকে ধ'রে শূলে চড়াব!' এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বলল, 'দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপ রে! আমরা খেতে না খেতেই ঝাঁ ক'রে কোন্‌খান দিয়ে ফুরিয়ে গেল! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন; কালকের যত প্রসাদ, সব মহারাজ একাই খাবেন!' রাজা তাতে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খবরদার! মনে থাকে যেন।'

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই একপ্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে ব'সে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে ব'সে তাঁকে ঘিরে তামাশা দেখছে। আর পুজোর ঘটা অন্যদিনের চেয়ে শতগুণ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশী হয়ে রাজামশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দেবেন।

রাত-দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরো আশ্চর্য রকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চুড়োয় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জম-কালো পোশাক, মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন

সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে, দু হাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই ক'রে নাচনটা যে নাচলেন!

এমন সময় গুপি আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চুড়ো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' 'ঠাকুর এসেছেন' ব'লে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না; রাজামশাইতো লম্বা হয়ে মাটিতে প'ড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপি তাঁকে বলল, 'মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি; এসো তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।' রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি, সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল। সকলে 'জয় জয়' বলে চেঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপি আর বাঘা রাজামশাইকে খুব ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বলল, 'এখন তবে আমাদের ঘরে যাব!' বলতে বলতেই তারা তাঁকে সুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁ ক'রে আকাশের পানে চেয়ে রইল। তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে বলল, 'কী আশ্চর্যই দেখলাম! রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গেলেন! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন!'

এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয়নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে, সেই দু'টো ভূত তাঁর মাথার কাছে ব'সে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে প'ড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না! আমি দুশো মোষ মেরে তোমাদের পূজো করব।'

গুপি, বলল, 'মহারাজ, আপনার কোনো ভয় নেই। আমরা

ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।' রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোনো কথা না ব'লে মাথা গুঁজে ব'সে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল, 'কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধ'রে এনেছি ; এখন কী আজ্ঞা হয় ?' হাল্লার রাজা বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এসো।'

দুই রাজার যখন দেখা হল, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধ'রে এনেছে। হাল্লা জয় করা তো তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়তো আমার রাজ্যও যেত, প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কী উপকার করতে পারি ? শুণ্ডীরাজ্যের অর্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।'

তখন খুবই একটা ধুমধাম হল। গুপি আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সংগীতের চর্চা করতে লাগল। গুপির মা-বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে ?

ছোট ভাই

সাতটি ভাই ছিল, তাহাদের সকলের ছোটটির নাম ছিল রুরু। দেশের মধ্যে তারা সাতটি ভাই দেখতে আর সকল ছেলের চেয়ে সুন্দর ছিল ; তাহাদের মধ্যে আবার রুরু ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর। রুরুকে সকলেই কেন এত সুন্দর বলে আর তাদের বলে না, এই জন্য
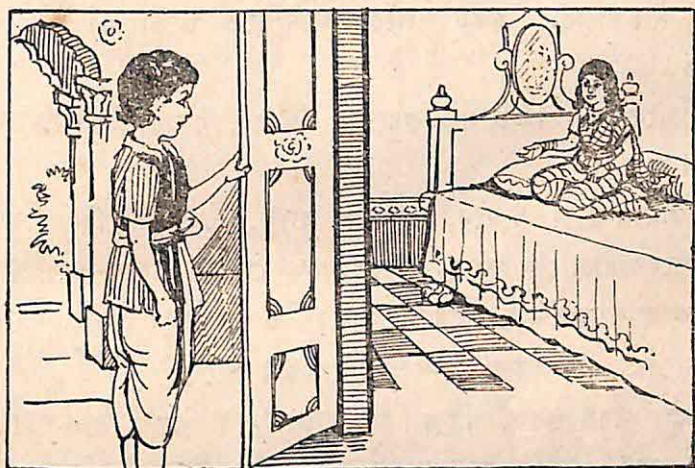
রুরুর বড় ভাইয়েরা তাকে বড্ড হিংসা করত। ভাল ভাল কাপড়-গুলো সব তারা ছজনায় পরে বেড়াত, রুরুকে পরতে দিত শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া। যত বিচ্ছিরি নোংরা কাজ, সব তারা রুরুকে দিয়ে করাত, আর নিজেরা বাবুগিরি করে বেড়াত। তবু সকল লোকে রুরুকেই বেশি ভাল বাসত, বড় কটিকে কেউ দেখতে পারত না। তাতে তারা আরো চটে রুরুকে যখন তখন ধরে ঠ্যাঙাত। বেচারাকে এক দণ্ডও সুখে থাকতে দিত না।

রুরুদের গ্রাম থেকে ঢের দূরে ররঙ্গা বলে একটি মেয়ে থাকত। এমন সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তার কথা শুনেই রুরুর দাদারা বলল, 'চল্, আমরা সেই মেয়েকে দেখতে যাব। আমাদের মতো সুন্দর ছেলে আর কোথায় আছে? আমাদের

দেখলেই নিশ্চয় সেই মেয়ে আমাদের একজনকে হয়ত বিয়ে করে ফেলবে।'

তখন তো তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসাহ হল। ছজনের প্রত্যেকে ভাবল, ররঙ্গী নিশ্চয়ই আমাকেই বিয়ে করবে। কত গহনা এনে যে তারা তাদের ছটি পুঁটলির ভিতরে পুরল, তার লেখাজোখা নেই। মস্ত বড় পানসি তাদের জন্য তয়ের হল। ছভাই মিলে আজ কত রকম করেই পোশাক পরেছে আর চুল আঁচড়াচ্ছে; একটু পরে পানসিতে চড়ে বউ আনতে যাবে।

তাদের মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোরা রুরুকে সঙ্গে নিবি না?'

অমনি তারা ছজনে একসঙ্গে বলল, 'নেব বই কি। নইলে আমাদের রান্না কে করবে? ররঙ্গাকে দেখতে যাবার সময় আমরা তাকে আমাদের বাসায় রেখে যাব। ও যে ছেঁড়া কাপড় পরে, ও আমাদের ভাই, একথা জানলে লোকে কী বলবে?'

রুরু সবই শুনল, কিন্তু কিচ্ছু বলল না। সেও তার দাদাদের সঙ্গে সেই পানসি চড়ে ররঙ্গাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানকার লোকেরা এর আগেই শুনতে পেয়েছিল যে, কয়েকটি খুব সুন্দর ছেলে তাদের দেশে বউ খুঁজতে যাচ্ছে। তারা সেই পানসি পৌঁছিবামাত্রই এসে রুরুর দাদাদের আদর করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বাড়ি ঘর সাজিয়ে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করে রেখেছিল।

ছভাই হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে তাদের সঙ্গে চলে গেল। রুরুকে বলে গেল, আমাদের জন্য একটি বাসা ঠিক করে জিনিসপত্র সব তাতে নিয়ে রাখবি।

তারপর তাদের খাওয়া দাওয়া। আমোদ-আহ্লাদ খুবই হল। সেখানে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কোনটি যে ররঙ্গা, ছভাইয়ের কেউ তা বুঝতে পারল না। তাদের প্রত্যেকেই তার পাশের

মেয়েটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্‌টি ররঙ্গা ?' সেই মেয়েদের প্রত্যেকেই বলল. 'আমিই ররঙ্গা, কাউকে বোলো না।'

একথা শুনে তো আর ভাইদের আনন্দের সীমাই রইল না। অত সহজে ররঙ্গাকে পেয়ে ফেলবে, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তখনই সেই মেয়েগুলোর সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই ভাবল, ররঙ্গাকে বিয়ে করেছে। ঠকেছে যে, সে কথা কারুরই মনে হল না!

রুরু বেচারা এত কথার কিচ্ছু জানে না, আর তার জানবার দরকারই বা কী ? প্রথম দিন বাসা ঠিকঠাক করে সে কলসী হাতে জল আনতে বেরিয়েছিল। জল কোথায় আছে তা তো সে আর জানে না, তাই সে একটি ছোট্ট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ গা, কোথায় জল পাব ?' মেয়েটি বলল, 'ঐ যে ররঙ্গার বাড়ি, তারই পাশে ঝরণা আছে।'

রুরু সেই দিকে জল আনতে চলল। যেতে যেতে সে ভাবল, 'ররঙ্গা তো ভোজে গিয়েছে ; এর মধ্যে আমি একটু উঁকি মেরে দেখে নিই না। তার বাড়িটি কেমন।' এই ভেবে সে আস্তে আস্তে সেই ঘরটির দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। উঁকি মেরে আর তার সেখান থেকে চলে আসবার কথা মনে রইল না। সে দেখল, ঘরের ভিতরে ররঙ্গা বসে আছে! নিশ্চয় সে ররঙ্গা নইলে এত সুন্দর আর কে হবে ?

ররঙ্গা তাকে দেখেই ভারী খুশী হয়ে অমনি তাকে ডাকল, 'এসো, এসো, ঘরে এসো।' রুরু জড়সড় হয়ে ঘরে গেল। তখন ররঙ্গা জিজ্ঞাসা করল 'তুমি কে ?'

রুরু বলল, 'সেই যে ছজন লোক বউ খুঁজতে এসেছে! যাদের জন্য ভোজ হচ্ছে, আমি তাদের ছোট ভাই।'

ররঙ্গা বলল, 'তুমি কেন তবে ভোজ খাও নি ?' রুরু বলল, 'আমাকে তারা নিয়ে যায় নি, কাজ করবার জন্য বাসায় রেখে গেছে।

আমার এর চেয়ে ভাল কাপড় নেই। এগুলো কাজ করতে করতে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে।'

রুরুকে দেখেই ররঙ্গার যারপর নাই ভাল লেগেছিল, তার কথা শুনে তার বড়ই দুঃখ হল। সে বুঝতে পারল যে রুরুর দাদারা বড় দুষ্টু। তাকে কষ্ট দেয়। তখন রুরুকে তার আরও ভাল লাগল। দুদিন পরে তাদের বিয়েও হয়ে গেল।

তার পরদিন রুরুর দাদারা বউ নিয়ে ঘরে যাবে। রুরু যে তার আগেই ররঙ্গাকে নিয়ে নৌকার তলায় লুকিয়ে রয়েছে, সে কথা তাদের কেউ টের পায় নি। তারা ভারী ধুমধাম করে দেশে এল। তারপর বউ নিয়ে বাড়িতে পা দিয়েই সকলের বড় ভাই তাদের মাকে বলল, 'এই দেখো মা, ররঙ্গাকে বিয়ে করে এনেছি!' অমনি তার ছোট ভাই তার চেয়ে বেশি করে চেঁচিয়ে বলল, 'না মা, ও মিছে কথা বলছে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

তখন তো ভারী মজা হল। সবাই বলছে, 'ওদের কথা মিথ্যে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

ভয়ানক চটাচটি, মারামারি হয় হয়। বউকটি থতমত খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তারা ভাবে নি যে এত সহজে তারা ধরা পড়ে যাবে।

তখন মা বললেন, 'বাবা, ররঙ্গা তো ছটি নয়, আর এদের একটিও তেমন সুন্দরী নয়। তোমরা ঠকে এসেছ।' রুরু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, মার কথা শুনে সে বলল, 'ঠিক বলেছ মা, ঠকে এসেছে। আমার সঙ্গে এসো, আমি ররঙ্গাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এ কথায় রুরুর দাদারা তো হেসেই গড়াগড়ি দিতে লাগল; কিন্তু মা বললেন, 'আচ্ছা গিয়েই দেখি না।' বলেই তিনি রুরুর সঙ্গে নৌকোয় এলেন, আর একটিবার ররঙ্গার মুখের দিকে চেয়েই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। সে খবর দেখতে দেখতে গ্রামময় ছেয়ে ফেলল। তখন পাড়ার ছেলে বুড়ো, গিন্নী বউ সকলে ছুটে এসে, ররঙ্গাকে ঘিরে নাচতে লাগল।

এ সব দেখে দাদারা চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে তাদের স্ত্রীদের বলল, 'বটে? ফাঁকি দিয়েছিস?' শুনে সকলে হো হো করে হাসল। তাদের মা বললেন, 'আর কেন বাছা? চুপ করো! তোমরা যেমন, তোমাদের তেমনি জুটেছে।

দুষ্ট দানব

এক দানব আর এক চাষা। দুজনে পাশা খেলছিল। খেলায় চাষার হার হল।
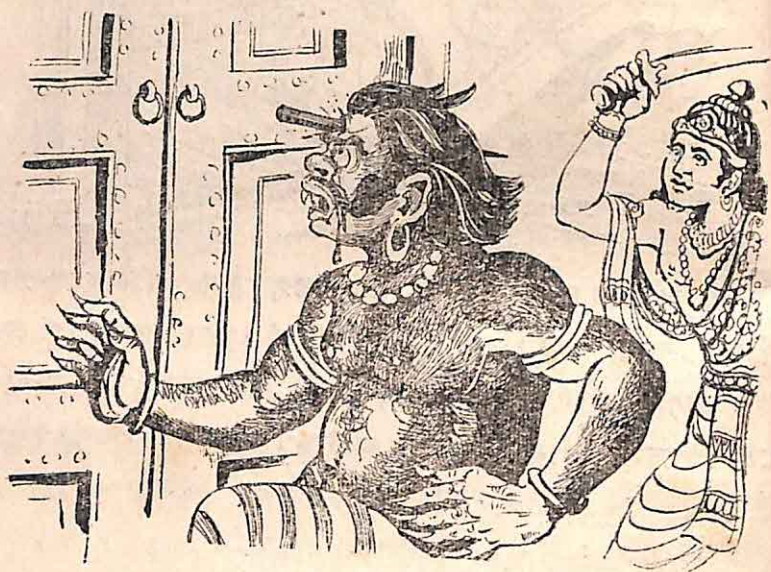
পাশায় হেরে চাষা হায় হায় করতে লাগল। খেলবার আগে সে বাজি রেখেছিল যে, সে হারলে দানব তার ছেলেটিকে নিয়ে যাবে। এখন উপায় কী হবে? দানব কিছুতেই ছাড়ছে না; সে বলেছে, 'কালই এসে আমি ছেলে নিয়ে যাব। যদি তাকে রাখতে চাও, তবে এমন করে তাকে লুকিয়ে রেখে দাও যাতে আমি খুঁজে বার করতে না পারি। খুঁজে পেলে কিন্তু আর তাকে আর ফেলে যাব না।'

হায় কী বিপদ! ছেলেটিকে কোথায় লুকোবে? যেখানেই রাখুক, দানব নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে। চাষা ভেবে কিছু বুঝতে না পেরে শেষে দেবতার রাজাকে ডাকতে লাগল। দেবতার রাজা তাঁর দুঃখ দেখে দয়া করে বললেন, 'তোমার কোনো চিন্তা

নেই। আমি তোমার ছেলেটিকে এমন করে লুকিয়ে দেব যে দানবের বাবাও তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

এই বলে তিনি ছেলেটিকে গমের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা ছোট্ট গমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন। তার পরদিন দানব এসে চাষার ঘরে, বাগানে, পুকুরে, বাক্সে, উনুনে, হাঁড়িতে, হুঁকোর ভিতরে কতই খুঁজল, কোথাও ছেলেটিকে দেখতে পেল না। কিন্তু সে এমনি দুষ্ট দানব ছিল সে তখনি বুঝে নিল যে, তবে নিশ্চয় গমের ক্ষেতে গমের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে! অমনি সে কাস্তে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ করে গম কাটতে লাগল! সব গম কেটে, তারপর তার এক একটি করে দানা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখে সে দু-দণ্ডের মধ্যেই ধরে ফেলল যে, এই গমটার ভিতর চাষার ছেলে বসে আছে।

আর একটু হলেই সে সেই গমটার ভিতর থেকে চাষার ছেলেটিকে বার করে নিয়ে যেত। এর মধ্যে দেবতার রাজা এসে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি চাষার হাতে দিয়ে বললে, 'আমার যা সাধ্য আমি তা করেছি; এর বেশী আর পারব না।' দানব ছেলেটিকে নিতে না পেরে ভারী চটে বলল, 'বটে, আমাকে ফাঁকি দিলে? সে হবে না; আমি কাল আবার আসব।'

দেবতার রাজা যখন পারলেন না, তখন চাষা আলোর দেবতার কাছে গেল। আলোর দেবতা এসে তার ছেলেটিকে একটি রাজ-হাঁসের পালক বানিয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু তাতে কি দানবকে ঠকাবার জো আছে? সে এসেই হাঁসের গলা ছিঁড়ে পালকটি সুদ্ধ তাকে মুখে দিতে গিয়েছে। ভাগ্যিস পালকটি তখন তার ঠোঁটে লেগে রইল, নইলে আর উপায়ই ছিল না। পালকটিকে দানবের ঠোঁটে লাগতে দেখেই আলোর দেবতা সেটিকে উড়িয়ে নিয়ে চাষার কাছে পৌঁছে দিলেন, আর বললেন, 'আমি আর কিছু করতে পারব না।' দানব সেদিনও ঠকে গেল, কিন্তু যাবার সময় বলে গেল, 'কাল আবার আসব।'

দেবতার রাজা হেরে গেলেন, আলোর দেবতা হেরে গেলেন। চাষা তখন আগুনের দেবতাকে ডেকে বলল, 'ঠাকুর! আপনি আমার ছেলেটিকে বাঁচান!' আগুনের দেবতা তখন ছেলেটিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে একটা মাছের পেটের মধ্যে তার একটি ডিমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন।

দানব কিন্তু এর সবই টের পেয়েছে, আর তাই এবারে সে ছিপ নিয়ে তয়ের হয়ে এসেছে। সমুদ্রে কত কোটি কোটি মাছ, তার ভিতর থেকে সে সেই মাছটাকে দেখতে দেখতে ধরে ফেলল। সেই মাছটার পেটে কত কোটি কোটি ডিম, তার ভিতর থেকে সে সেই ডিমটাকে দেখতে দেখতে খুঁজে বার করল।

তখন আগুনের দেবতা সেই ডিমটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চুপি চুপি ছেলেটিকে বললেন, 'শিগগির ঘরে পালিয়ে যা; ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিস।' একথা তখন দানব শুনতে পায় নি। তারপর ছেলেটি পালিয়ে অনেক দূরে গেলে সে তাকে দেখতে পেল। অমনি ঘোঁত করে লাফিয়ে উঠে সে তার পিছু পিছু ছুটল। কিন্তু ছেলেটি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে গিয়েছে। দানবটাও তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি গেল সেই ঘরে ঢুকতে। সে জানত না যে আগুনের দেবতা এর আগেই কখন সেই ঘরের দরজায় তিন হাত লম্বা এক লোহার খোঁচা বসিয়ে রেখেছেন। দানব রাগে ভূত হয়ে ঘরে ঢুকবার সময় সেই খোঁচা আগাগোড়া গেল তার মাথায় ঢুকে। তখন সে ভয়ানক চেঁচিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে যেতেই আগুনের দেবতা ছুটে এসে তার একটা পা কেটে ফেললেন।

কিন্তু পা কাটলে কী হবে? দুষ্ট দানব তাকে কী জাদুই করে রেখেছে—সেই কাটা পাখানি এসে আবার জোড়া লেগে গেল! যা হোক আগুনের দেবতা সেই দানবের থেকে বড় জাদুকর ছিলেন; তিনি জানতেন যে কাটা জায়গায় লোহা আর পাথর ফেলে দিলে আর তা জোড়া লাগতে পারে না। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি দানবের আর একটা পা কেটেই লোহা আর পাথর দিয়ে কাটা জায়গা চাপা দিয়ে

ফেললেন। তখন আর দানবের জাদু খাটল না। দেখতে দেখতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তখন তো চাষার খুবই আনন্দ হল। সে আগুনের দেবতাকে কত প্রণাম যে করল তা গুনে শেষ করা যায় না। তারপর থেকে সে সকলকে বলত যে, 'এই দেবতাটির মতো দেবতা নেই।'

মজন্তালী সরকার

এক গ্রামে দুটো বিড়াল ছিল। তার একটা থাকত গোয়ালাদের বাড়িতে, সে খেত দই, দুধ, ছানা, মাখন আর সর। আর একটা থাকত জেলেদের বাড়িতে, সে খেত খালি ঠেঙার বাড়ি আর লাথি। গোয়ালাদের বিড়ালটা খুব মোটা ছিল। আর সে বুক ফুলিয়ে চলত, জেলেদের বিড়ালটার গায় খালি চামড়া আর হাড় কখানি ছিল। সে চলতে গেলে টলত, আর ভাবত, কেমন করে গোয়ালাদের বিড়ালের মতো মোটা হব।

শেষে একদিন সে গোয়ালাদের বিড়ালকে বললে, 'ভাই, আজ আমার বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ।'

সব কিন্তু মিছে কথা। নিজেই খেতে পায় না। সে আবার নিমন্ত্রণ খাওয়াবে কোথা থেকে? সে ভেবেছে, 'গোয়ালাদের বিড়াল আমাদের বাড়ি এলেই আমার মতন ঠেঙা খাবে আর মরে যাবে, তারপর আমি গোয়ালাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব।'

যে কথা সেই কাজ। গোয়ালাদের বিড়াল জেলেদের বাড়িতে আসতেই জেলেরা বললে, 'ঐ রে! গোয়ালাদের সেই দই-দুধ-খেকো

চোর বিড়ালটা এসেছে, আমাদের মাছ খেয়ে শেষ করবে। মার বেটাকে!'

বলে তারা তাকে এমনি ঠেঙাল যে, বেচারা তাতে মরেই গেল। রোগা বিড়াল তো জানতই যে, এমনি হবে। সে তার আগেই গোয়ালাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে! সেখানে খুব করে ক্ষীর সর খেয়ে, দেখতে-দেখতে সে মোটা হয়ে গেল। তখন আর সে অন্য বিড়ালের সঙ্গে কথা কয় না, আর নাম জিগগেস করলে বলে, 'মজন্তালী সরকার।'

একদিন মজন্তালী সরকার কাগজ কলম নিয়ে বেড়াতে বেরুল। বেড়াতে বেড়াতে সে বনের ভিতরে গিয়ে দেখলে যে তিনটি বাঘের ছানা খেলা করছে। সে তাদের তিন তাড়া লাগিয়ে বলল, 'এই য়ো! খাজনা দে!' বাঘের ছানাগুলো তার কাগজ কলম দেখে আর ধমক খেয়ে বড্ড ভয় পেল। তাই তারা তাড়াতাড়ি তাদের মায়ের কাছে গিয়ে বললে, 'ও মা, শিগগির এস! দেখ একটা কি এসেছে, আর কি বলছে!'

বাঘিনী তাদের কথা শুনে এসে বললে, 'তুমি কে বাছা! কোথা থেকে এলে? কি চাও?'

মজন্তালী বললে, 'আমি রাজার বাড়ির সরকার, আমার নাম মজন্তালী। তোরা যে আমাদের রাজার জায়গায় থাকিস, তার খাজনা কই? খাজনা দে!'

বাঘিনী বললে, 'খাজনা কাকে বলে তা তো আমি জানিনে! আমরা খালি বনে থাকি, আর কেউ এলে তাকে ধরে খাই! তুমি না হয় একটু বস, বাঘ আসুক।'

তখন মজন্তালী একটা উঁচু গাছের তলায় বসে চারিদিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। খানিক বাদেই সে দেখল—ঐ বাঘ আসছে। তখন সে তাড়াতাড়ি কাগজ কলম রেখে একেবারে গাছের আগায় গিয়ে উঠল।

বাঘ আসতেই তো বাঘিনী তার কাছে সব কথা বলে দিয়েছে।

আর বাঘের যে কি হয়েছে কি বলব ! সে ভয়ানক গর্জন করে বললে, 'কোথায় সে হতভাগা ? এখুনি তার ঘাড় ভাঙচি !'

মজন্তালী গাছের আগা থেকে বললে, 'কিরে বাঘা, খাজনা দিবি না ? আয়, আয় !'

শুনেই তো বাঘ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, 'হাল্লুম !' বলে দুই লাফে সেই গাছে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু খালি উঠলে কি হয় ? মজন্তালীকে ধরতে পারলে তো ! সে একটুখানি হালকা জন্তু। সেই কোন সরু ডালে উঠে বসেছে, অতবড় ভারি বাঘ সেখানে যেতেই পারছে না। না পেরে রেগে মেগে বেটা দিয়েছে একলাফ, অমনি পা হড়কে গিয়েছে পড়ে। পড়তে গিয়ে, দুই ডালের মাঝখানে মাথা আটকে, তার ঘাড় ভেঙে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে।

তা দেখে মজন্তালী ছুটে এসে তার নাকে তিন চারটে আঁচড় দিয়ে, বাঘিনীকে ডেকে বললে, 'এই দেখ, কি করেছি। আমার সামনে বেয়াদবি !'

এসব দেখে শুনে তো ভয়ে বাঘিনী বেচারীর প্রাণ উড়ে গেল ! সে হাত জোড় করে বললে, 'দোহাই মজন্তালী মশাই, আমাদের প্রাণে মারবেন না ! আমরা আপনার চাকর হয়ে থাকব।'

তাতে মজন্তালী বললে, 'আচ্ছা, তবে থাক, ভালো করে কাজকর্ম করিস, আর আমাকে খুব ভালো খেতে দিস।'

সেই থেকে মজন্তালী বাঘিনীদের বাড়িতেই থাকে। খুব করে খায়, আর বাঘিনীর ছানাগুলির ঘাড়ে চড়ে বেড়ায়। সে বেচারারা তার ভয়ে একেবারে জড়-সড় হয়ে থাকে, আর তাকে মনে করে নাজানি কত বড় লোক !

একদিন বাঘিনী তাকে হাত জোড় করে বললে, 'মজন্তালী মশাই, এখানে খালি ছোট-ছোট জানোয়ার, এতে কিছু আপনার পেট ভরে না। নদীর ওপারে খুব ভারি বন আছে, তাতে খুব বড় বড় জানোয়ারও থাকে। চলুন, সেইখানেই যাই।'

শুনে মজন্তালী বললে, 'ঠিক কথা ! চল ওপারে যাই।' তখন

বাঘিনী তার ছানাদের নিয়ে, দেখতে দেখতে ওপারে চলে গেল। কিন্তু মজন্তালী কই? বাঘিনী আর তার ছানারা অনেক খুঁজে দেখল—ঐ মজন্তালী সরকার নদীর মাঝখানে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে! স্রোতে তাকে ভাসিয়ে সেই কোথায় নিয়ে গিয়েছে, আর ঢেউয়ের তাড়ায় তার প্রাণ যায়-যায় হয়েছে!

মজন্তালী তো ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, আর দুটো ঢেউ এলেই সে মারা যাবে! এমন সময় ভাগ্যিস বাঘিনীর একটা ছানা তাকে তাড়াতাড়ি ডাঙায় তুলে এনে বাঁচাল, নইলে সে মরেই যেত, তাতে আর ভুল কি?

কিন্তু মজন্তালী সরকার তাদের সে কথা জানতেই দিল না। সে ডাঙায় উঠেই ভয়ানক চোখ রাঙিয়ে বাঘের ছানাকে চড় মারতে গেল, আর গাল যে কত দিল তার তো লেখা জোখাই নেই। শেষে বললে, 'হতভাগা মূর্খ, দেখ দেখি কি করলি! আমি অমন চমৎকার হিসাবটা করছিলুম, সেটা শেষ না হতেই তুই আমাকে টেনে তুলে আনলি—আর আমার সব হিসাব গুলিয়ে গেল। আমি সবে গুনছিলুম, নদীতে কটা ঢেউ, কতগুলো মাছ আর কতখানি জল আছে। মূর্খ বেটা, তুই এর মধ্যে গিয়ে সব গোলমাল করে দিলি! এখন যদি আমি রাজা-মশাইয়ের কাছে গিয়ে এর হিসাব দিতে না পারি, তবে মজাটা টের পাবি!'

এসব কথা শুনে বাঘিনী তাড়াতাড়ি এসে হাত জোড় করে বললে, 'মজন্তালী মশাই, ঘাট হয়েছে, এবারে মাপ করুন। ওটা মূর্খ, লেখাপড়া জানে না, তাই কি করতে কি করে ফেলেছে।'

মজন্তালী বললে, 'আচ্ছা, এবারে মাপ করলুম। খবরদার! আর যেন কখনো এমন হয় না!' এই বলে মজন্তালী তার ভিজে গা শুকাবার জন্যে রোদ খুঁজতে লাগল।

ভারি বনের ভিতরে সহজে রোদ ঢুকতে পায় না। সেখানে রোদ খুঁজতে গেলে উঁচু গাছের আগায় গিয়ে উঠতে হয়। মজন্তালী একটা গাছের আগায় উঠে দেখলে যে, এই বড় এক মরা মহিষ মাঠের

মাঝখানে পড়ে আছে। তখন সে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মহিষটার গায় কয়েকটা আঁচড় কামড় দিয়ে এসে বাঘিনীকে বললে, 'শিগগির যা, আমি একটা মোষ মেরে এসেছি।'

বাঘিনী আর তার ছানাগুলো ছুটে গিয়ে দেখলে, সত্যি মস্ত এক মোষ পড়ে আছে। তারা চারজনে মিলে অনেক কষ্টে সেটাকে টেনে আনলে, আর ভাবলে, 'ঈস! মজন্তালী মশাইয়ের গায়ে কি জোর!'

আর একদিন তারা মজন্তালীকে বললে, 'মজন্তালী মশাই, এ বনে বড় বড় হাতি আর গণ্ডার আছে। চলুন একদিন সেইগুলো মারতে যাই।'

একথা শুনে মজন্তালী বললে, 'তাইতো, হাতি গণ্ডার মারব না তো মারব কি? চল আজই যাই।'

বলে সে তখুনি সকলকে নিয়ে হাতি আর গণ্ডার মারতে চলল। যেতে যেতে বাঘিনী তাকে জিগগেস করলে 'মজন্তালী মশাই, আপনি খাপে থাকবেন, না ঝাঁপে থাকবেন?' খাপে থাকবার মানে কি? না, জন্তু এলে তাকে ধরে মারবার জন্যে চুপ করে গুড়ি মেরে বসে থাকা। আর ঝাঁপে থাকার মানে হচ্ছে, বনের ভিতরে গিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে জন্তু তাড়িয়ে আনা।

মজন্তালী ভাবলে, আমার তাড়ায় আর কোন জন্তু ভয় পাবে? তাই সে বললে, 'আমি ঝাঁপিয়ে যে সব জন্তু পাঠাব, তা কি তোরা মারতে পারিস? তোরা ঝাঁপে যা, আমি খাপে থাকি।'

বাঘিনী বললে, 'তাই তো সেসব ভয়ানক জন্তু কি আমরা মারতে পারব? চল বাছারা, আমরা ঝাঁপে যাই।'

এই বলে বাঘিনী তার ছানাগুলোকে নিয়ে বনের অন্য ধারে গিয়ে, ভয়ানক 'হাল্লুম-হাল্লুম' করে জানোয়ারদের তাড়াতে লাগল। মজন্তালী জানোয়ারদের ডাক শুনে একটা গাছের তলায় বসে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

খানিক বাদে একটা সজারু সড়-সড় করে সেইদিক পানে ছুটে এসেছে আর মজন্তালী তাকে দেখে 'মাগো' বলে সেই গাছের একটা

শিকড়ের আগায় গিয়ে লুকিয়েছে, এমন সময় একটা হাতি সেইখানে দিয়ে চলে গেল। সেই হাতির একটা পায়ের একপাশ সেই শিকড়ের উপরে পড়েছিল তাতেই মজন্তালীর পেট ফেটে গিয়ে বেচারার প্রাণ যায় আর কি!

অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে বাঘেরা ভাবলে, 'মজন্তালী মশাই না জানি এতক্ষণে কত জন্তু মেরেছেন, চল একবার দেখে আসি।' তারা মজন্তালীর দশা দেখে বললে, 'হায়-হায়! মজন্তালী মশায়ের এ কি হল?'

মজন্তালী বললে, 'আর কি হবে? তোরা সব ছোট-ছোট জানোয়ার পাঠিয়েছিলি? দেখে হাসতে হাসতে আমার পেটই ফেটে গিয়েছে।'

এই বলে মজন্তালী মরে গেল।

বিচিত্র গল্প

॥ এক ॥

যত্নর স্বভাবটা চিরদিনই একটু পাগলাটে ধরণের ছিল। আর সে যে ক্লাসে পড়ত, সে ক্লাসের মাষ্টার মশায়ের মেজাজটা ছিল তার চেয়েও আর একটু পাগলাটে, বেজায় রগচটা।

এর মধ্যে একদিন খবর এসেছে যে একজন ভারি বড় লোক ইস্কুল দেখতে আসবেন। মাষ্টার মশাইরা তাই সেদিন সকলেই সেজে-গুজে এসেছেন আর যতদূর সম্ভব গম্ভীর দেখাতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের সকলের মাথায়ই টুপি, খালি সেই পাগলাটে মাষ্টার মশায়ের মাথায় ভারি মজার ধরণের একটা পাগড়ী, সেটার রং লাল আর গড়নটা ঠিক যেন মন্দিরের চুড়োর মত। মাষ্টার মশাই আবার সেটাকে পিছন বাগে হেলিয়ে পরেছেন। কাজেই তাঁর চেহারাটি অবিকল কাঠঠোকরার মত হয়েছে। যত্নর কি দুর্মতি, সে আবার গিয়েছে সেই কথাটা পাশের ছেলেটির কানে কানে বলতে।

যেই বলা, অমনি সেই ছেলেটি ছুটে গিয়ে মাষ্টার মশাইকে বলেছে—'শুনেছেন স্যার, যত্ন রায় আপনাকে কাঠঠোকরা বলেছে।'

আগেই বলেছি যে মাষ্টারটি ছিলেন বড় রাগী! তিনি সেই ছেলের কথা শুনেই ইস্কুলের ঘর কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠলেন—'হু-ইজ যত্ন রায় ?' কে যত্ন রায় ? সেই গর্জন শুনে কি আর যত্ন সেখানে দাঁড়ায়, সে বেগতিক বুঝে তখনই বাড়ির পানে ছুট দিয়েছে। এদিকে মাষ্টার মশাই দুই চোখ লাল করে বিশাল বেত হাতে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন 'কে যত্ন রায় ?' ছেলেদের একজন বলল—'স্যার, যত্ন রায় মুন্সী মহাশয়ের ভাই।'

অমনি মাষ্টার মশাই—'কে যত্ন রায় ? কে যত্ন রায় ? কে যত্ন রায় ?' করে বেত হাতে মুন্সী মশায়ের বাড়ির দিকে ছুটলেন।

যত্নাথ ইস্কুল থেকে পালিয়ে ভেবেছিল এখন আর ভয় নেই।

তাই সে ধীরে সুস্থে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই চলছিল। এমন সময় মোড়ের আড়াল থেকে মাষ্টার মশাইয়ের সেই ভীষণ গর্জন তার কানে এসে পৌঁছল। তখন তাড়াতাড়ি নর্দমা পার হয়ে একটা ঝোপের ভিতর লুকানো ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? তাতে কিন্তু বিপদ বেড়েই গেল, এখন ত' মাষ্টারমশাই সটান গিয়ে মুন্সী মশাইর বাড়িতে উপস্থিত হবেন, আর তাহলে ডবল মার খেতে হবে, মাষ্টার মশায়ের হাতে আর বাড়ির লোকদের হাতে। তার চেয়ে এখানেই এখানেই এর শেষ হয়ে হওয়া ভাল ছিল।

এত কথা যে যদু ভেবেছিল, আমি তা বলছি না, কিন্তু মাষ্টার মশাই সেখানে আসতেই সে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিল, একথা ঠিক। তবে সেই উপস্থিত হওয়াটা ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। যদু তোমার আমার মত হেঁটে গিয়ে শান্ত ভাবে তাঁর কাছে দাঁড়ায় নি।

সে বিষম পাগলাটে আর বেজায় ষণ্ডা ছিল। মাষ্টার মশাই যেই সেখানে এসে বলেছেন 'কে যদু রায়?'

অমনি যদু 'আমি যদু রায়', বলে দিয়েছে সেই ঝোপের ভিতর থেকে এক লাফ আর পড়েছে ঠিক তাঁর সামনে। এত বড় লাফ

দিতে আর মাষ্টার মশাই তাঁর জন্মে কোন মানুষকে দেখেন নি। আর সেই জায়গাটিও ছিল একটু জংলাটে গোছের। যদুকে তখন তিনি বাঘ না ভূত, কি ভেবেছিলেন, তা ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু তিনি তাকে লাফিয়ে পড়তে দেখে বেত ফেলে 'মাগো' বলে যে সেখান থেকে ছুট দিয়েছিলেন, তেমন ছুট নিতান্ত বাঘের ভয়ে ছাড়া খুব কম লোকই দিতে পারে।

॥ দুই ॥

আকাশে চাঁদ উঠেছে আর ছোট ছোট মেঘ ভেসে চলছে। কয়েকটি ছেলে খেলা করছিল, তাদের একজন বলল, 'ঐ দেখ চাঁদটা কেমন ছুটে চলেছে।' তাই দেখে অন্য সকলে বলল, 'তাইত, চাঁদটা অমন ছুটেছে কেন?'

তাদের মধ্যে একটি আট বছরের ছেলে ছিল, সে কিন্তু বিশ্বাস করল না যে চাঁদ ছুটছে। সে তার সঙ্গীদের ডেকে একটা গাছের
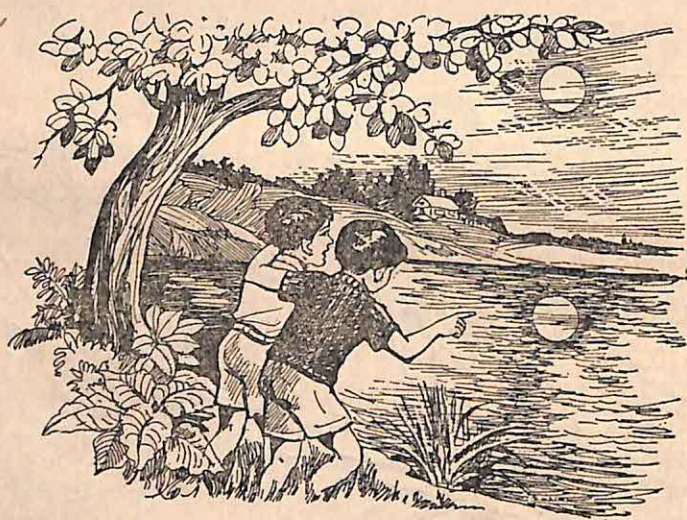
তলায় নিয়ে চলল—'এই গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখত চাঁদ ছুটছে না আর কিছু ছুটছে?' তখন সকলেই দেখল চাঁদ ছুটছে না, মেঘগুলোই ছুটছে। ছোট ছেলেটি জানত যে একটা স্থির

জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে চাঁদ না মেঘ কোনটা ছুটছে।

গাছের পাতা স্থির, তাই সে সকলকে গাছের পাতার ভিতর দিয়ে তাকাতে বলেছিল।

এই ছেলেটি বড় হয়ে শেষে পিয়ারে গ্যাসেণ্ডী নামে মস্ত জ্যোতির্বিদ হয়েছিল।

॥ তিন ॥

পূজার সময় ছেলেদের সকলের জন্যই সুন্দর সুন্দর জুতো এসেছে। নরেশের জুতো এসেছে বাদামী রঙের। সুরেশের জুতো এসেছে কালো।

সুরেশ বলল—'নরেশ-দাদা তোমার জুতো কি করে সাদা হল?' নরেশ তামাশা করে বলল—'তাও জানো না, আমার জুতো দুধে সিদ্ধ করেছিলাম তাতেই সাদা হয়েছে।'
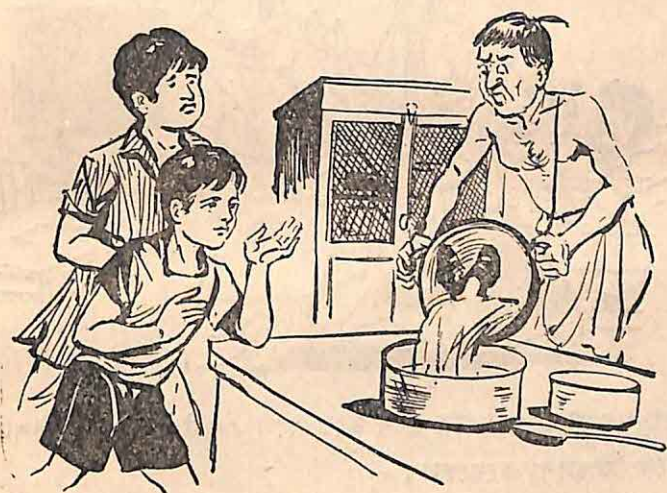
সুরেশ কি যেন ভাবল, কিন্তু কিছু বলল না। পরদিন সকালে ঠাকুর যেই দুধের কড়া থেকে দুধ ঢালতে গেছে, অমনি ধপাস ধপাস করে দুখানি ছোট ছোট কালো জুতো দুধের সঙ্গে বাটিতে পড়ল!

সকলেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে, দুধের ভিতর কি করে জুতো এল, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না ?

সুরেশ তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বলল 'দেখি, দেখি ! আমার জুতো সাদা হয়েছে কিনা ?'

॥ চার ॥

চিনাখালী ইস্কুলের মাষ্টার রায়মশাই বড় কড়া লোক ছিলেন। ছেলেরা তাঁর ভয়ে অস্থির থাকত, আর ভাবত কখন জানি তাঁর ঐ লকলকে বেতখানি সপাং করে কার ঘাড়ে এসে পড়ে।

এর মধ্যে একদিন চিনাখালী দেওয়ানজী ইস্কুল দেখতে এসেছেন, আর রায়মশাই শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে দেখাচ্ছেন। দেওয়ানজী মশাই ক্লাস দেখছেন, কাউকে কিছু বলেন নি।
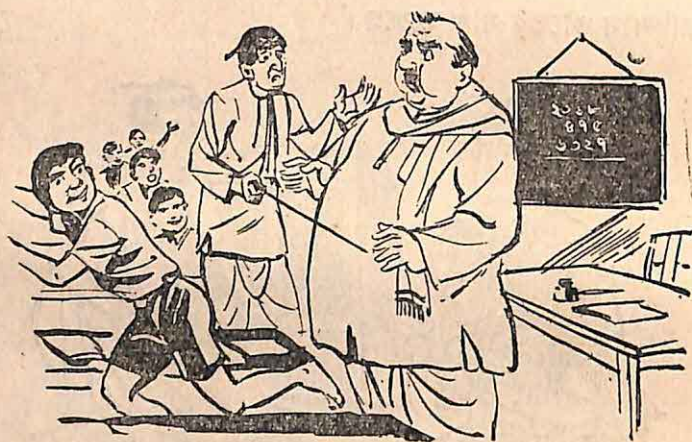
তারপর আরেক ক্লাসে এসে সতে বলে একটি পাতলা ছিপছিপে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছেন :—

'শশী' মানে কি ?'

সে ছেলেটি ছিল দুরন্তপনার সর্দার কিন্তু পড়াশোনায় আস্ত গাধা। সে তখন আনমনে কিসের কথা ভাবছিল, দেওয়ানজীর কথায় থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল

'আছে, তিনি আমার মেসোমশাই হন।' সে কথা শেষ হতে না হতেই 'সাঁই' করে একটা শব্দ হল। কিন্তু সতে তার আগেই, রায় মশায়ের হাত উঠতে দেখেই বন্দুকের গুলির মতন ছুটে পালিয়েছিল। রায় মশায়ের বেতখানা 'সাঁই' করে এসে, তাকে না পেয়ে 'চটাস' করে পড়ল দেওয়ানজীর জ্বালার মতন বিশাল ভুঁড়িতে! ছেলেরা তা দেখে হাসবার কথা ভুলে গেল, রায়মশায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ কপালে উঠল! দেওয়ানজী মশায়ের কথা আর কি বলব? বেচারা চটতেও পারছেন না, কাঁদতেও পারছেন না। জ্বালায় টিকতেও পারছেন না। লজ্জায় হাত বুলোতেও পারছেন না! গম্ভীর হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

একটা উঁচু স্তম্ভ বেঁকে গেছে, তাকে আবার সোজা করবার জন্য সকলে মিলে তাতে দড়ি বেঁধে টানছে। কিন্তু কিছুতেই তাকে
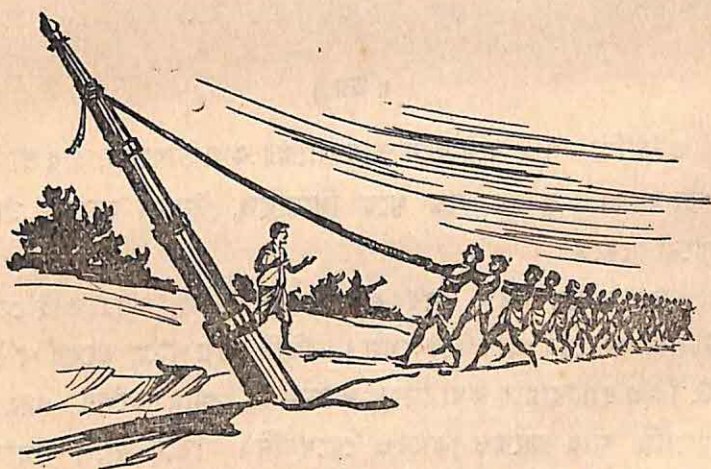
সোজা করতে পারছে না। চারিদিকে অনেক লোক দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে আর খালি বলছে—'এটা কর'—'ওটা কর'—'এইখানটায় বাঁধ'—'এমনি করে টান'! তাতে আরো কাজের গোল লেগে

যাচ্ছে। তখন এই হুকুম হল যে, যে আবার কথা বলবে, তার মাথা কাটা যাবে।

তা শুনে সকলেই চুপ করল, কিন্তু স্তম্ভ তবু সোজা হয় না। কি করলে যে সোজা হবে, সে কথা কেউ জানে না ,জানে খালি একজন লোক। সে বেচারা প্রাণের ভয়ে চুপ করে আছে। কিন্তু তার মনটা সেই কথাটুকু বলবার জন্য ছটফট করছে।

খানিক বাদে, সে আর থাকতে না পেরে, বলে ফেলল 'দড়িটা ভিজিয়ে দাও!'

দড়ি ভেজালে একটু খাটো হবে। সেই খাটো হওয়ার টান মানুষের টানের চেয়ে অনেক বেশি, সে টানে স্তম্ভকে সোজা করে দেবে।

কাজেও তাই হল। শত শত লোকের প্রাণপণ চেষ্টায় যে কাজ হচ্ছিল না, ভিজান দড়ির টানে দেখতে দেখতে তা হয়ে গেল। সেই লোকটির তখন খুব প্রশংসা হল, তার মাথা কাটবার কথা আর কেউ বলল না!

॥ ছয় ॥

ভটচায্যি মশাই ঘরে বসে ন্যায় শাস্ত্রের কথা ভাবছেন, তাঁর ব্রাহ্মণী একটা দরকারী কাজে অন্য ঘরে গিয়েছিল, উনানে ডালের হাঁড়ি চড়ানো রয়েছে।

এমন সময়ে হঠাৎ সেই জল উথলে উঠল, আর তাই দেখে ভটচায্যি মশায়ের প্রাণ উড়ে গেল! তিনি ন্যায় শাস্ত্রে ভয়ঙ্কর পণ্ডিত বটে, কিন্তু রান্নাবান্নার কথা কিচ্ছু জানেন না, আর জলের এমনতর পাগলামি আর জন্মেও কখনও দেখেননি। তিনি খালি পাগলের মতন ছুটে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন—'হায়, হায়! কি হবে?'

ততক্ষণে ব্রাহ্মণী ঘরে এসে জলে খানিকটা তেল ঢেলে দিয়েছেন আর অমনি তাঁর রাগ থেমে সে চুপ হয়ে গেছে।

ভটচায্যি মশাই সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে জোড়হাতে ব্রাহ্মণীর স্তব করতে করতে বললেন—'তেল ঢেলে প্রলয় আনিয়ে দিলে! বল তুমি কোন দেবতা!'

বাস্তবিক, খ্যাপা জলকে শান্ত করার ক্ষমতা তেলের খুব আছে। শোনা যায়, সমুদ্রে তেল ঢেলে অনেক জাহাজ নাকি ঝড়ের হাত থেকে বেঁচেছে।

বুদ্ধিমান চাকর

এক কাজি সাহেবের এক চাকর ছিল, তার নাম বুদ্ধু। চাকরটা একে বিদেশী, তাতে বুদ্ধি-শুদ্ধির ধার ধারে না—কাজেই কাজি সাহেবের মহামুস্কিল। চাকরটা কায়দা কানুন কিছুই জানে না—বাড়ীতে লোক আস্‌লে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একদিন কাজি সাহেব তাকে তুই ধমক দিয়ে বল্‌লেন 'ফের যদি এরকম বেয়াদবী

করিস্—কাউকে সেলাম না করিস। তবে তোকে আমি দেখাব। সকলকে খাতির কর্‌বি আর 'সেলাম' বল্‌বি।'

সেই থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যাকে দেখে সকলকেই বুদ্ধু 'সেলাম' করে। ছেলে বুড়ো মানুষ গরু কাউকে বাদ দেয় না। এক গাধাওয়ালা তার গাধা নিয়ে চলেছে—চাকরটা তাকে সেলাম করল আর গাধাগুলোকেও খুব খাতির ক'রে বলল 'সেলাম'। তা শুনে গাধাওয়ালা খুব হাসতে লাগল, আর বলল, 'দূর আহাম্মক, ওদের বুঝি সেলাম বলতে হয়। ওদের 'হেই হেই' ক'রে চালাতে হয়।' বুদ্ধু বেচারা কিছু দূর গিয়ে দেখল একজন শিকারী ফাঁদ পেতে বসে আছে। আর অনেকগুলো পাখী সেই ফাঁদের কাছে ঘুরছে। তাই

দেখে সে 'হেই হেই' ক'রে এম্‌নি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল যে পাখী টাখী সব উড়ে পালাল। শিকারী ত চটে লাল!

আর একদিন এক বড় লোকের বাড়ীতে কাজি সাহেবের নেমন্তন্ন। বুদ্ধু ও সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। তারা নবাব বংশের লোক—আশ্চর্য তাদের আদব-কায়দা। খেতে খেতে নিমন্ত্রণ-কর্তার দাড়িতে একটা ভাত পড়ল—অমনি একজন চাকর যেন গান করছে এম্‌নি ভাবে গুণ গুণ ক'রে বলতে লাগল—

'ফুলের তলে বুল্‌বুল ছানা
তারে উড়িয়ে দেনা—উড়িয়ে দেনা—'

অমনি তার মনিব ইসারা বুঝ্‌তে পেরে দাড়ি ঝেড়ে ভাত ফেলে দিল। কাজি সাহেব বাড়ী এসে বুদ্ধুকে বললেন, "দেখ্‌লি ত কেমন কায়দা! আমার দাড়িতে যদি খাবার সময় ভাত লাগে তুইও ঠিক তেমনি ক'রে বলবি।" তারপর একদিন কাজি সাহেবের বাড়ীতে খুব ভোজ হচ্ছে। কাজি সাহেব চাকরের কেরামতি দেখাবার জন্য ইচ্ছা ক'রে তাঁর দাড়িতে একটা ভাত ফেলে দিলেন আর বুদ্ধুকে চোখ টিপে

ইসারা করলেন। বুদ্ধু অমনি চেঁচিয়ে বলল, 'সেই যে সেদিন অমুক্‌দের বাড়ীতে না কিসের কথা হ'য়েছিল? আপনার দাড়িতে তাই হয়েছে—তানানা তানা।' শুনে সব লোক হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

একদিন মনিব বল্লেন 'দেখ্ তুই বড় বিশ্রী ভাত রাঁধিস্। তুই এখনও ফেন গালাতেই শিখিস্নি। আজ যখন ভাত বানাবি, ভাত সিদ্ধ হলেই আমাকে ডাকিস্ আমি দেখিয়ে দেব। আমাকে না দেখিয়ে কিছু করিস্ নি।'

সেদিন ভাত সিদ্ধ হ'তেই ত চাকর মনিবকে ডাকতে গিয়েছে। দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে একটা আঙুল দিয়ে ইসারা ক'রে সে মনিবকে ডাকতে লাগ্‌ল। কাজি সাহেব তখন দরজার দিকে পিছন ফিরে কি যেন লিখছিলেন তিনি এ সব কিছুই জানেন না। চাকরটা ঘণ্টাখানেক এই রকম "ডেকে" শেষটায় হয়রান হ'য়ে পড়ল। তখন সে রেগে চীৎকার করে বল্ল, "আর কতক্ষণ ডাক্‌ব ?—এদিকে ভাতটাত সব ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।" তখন কাজি সাহেব ফিরে দেখেন চাকর তাঁকে একটা আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করছে—ওদিকে সত্যি সত্যিই ভাত পুড়ে ছাই।

একদিন রাত্রে কাজি সাহেবের বাড়ী চোর ঢুকেছে। বুদ্ধু খচ্‌মচ্ শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'কেরে ?' চোরটা গম্ভীর ভাবে বলল, 'কেউ নই বাবা, কেউ নই।' তা শুনে বুদ্ধু আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাতে লাগ্‌ল। সকালে উঠে কাজী সাহেব দেখেন তাঁর সব চুরি হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধুকে জিজ্ঞাসা ক'রে যখন রাত্রের সব শুন্‌লেন তিনি খুব রেগে গালাগালি করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু বুদ্ধু তাতে মুখ ভারি বেজার করে বলল—"তা কি করব—সে আমায় বার বার করে বললে 'কেউ নই, কেউ নই'। লোকটা ত দেখছি শুধু চোর নয়, ব্যাটা বেজায় মিথ্যাবাদী।"

একদিন কাজি সাহেব সহরের বাইরে কোথায় যাবেন। যাবার সময় বুদ্ধুকে বলে গেলেন, 'দেখিস্ দরজাটার উপর ভাল করে চোখ রাখিস্—দরজা ছেড়ে কোথাও যাস্‌নে, তাহলে চোরে আমার সব নিয়ে যাবে।' কাজি সাহেব চলে গেলেন—চাকর বেচারা এক লাঠি নিয়ে দরজায় পাহারা দিতে লাগল। একদিন গেল, দু দিন গেল। তার পরদিন বুদ্ধ শুনল এক জায়গায় ভারি তামাসা দেখানো

হচ্ছে। তাই ত, বেচারা কি করে? অনেক ভেবে সে কর্‌ল কি বাড়ীর দরজাখানা খুলে সেটাকে ঘাড়ে নিয়ে তামাসা দেখ্‌তে গেল। এদিকে বাড়ীতে চোর ঢুকে যা কাণ্ড করে গেল সে আর কি বল্‌ব। কাজি সাহেব বাড়ীতে এসে দেখেন—সর্বনাশ, বাড়ীর সিন্দুক আল্‌মারি সব খালি। ওদিকে বুদ্ধু ব'সে তামসা দেখ্‌ছে আর খুব সাবধানে দরজা পাহারা দিচ্ছে।

জাপানী দেবতা

জাপান দেশে 'কোজিকী' বলে একখানা পুরনো পুঁথি আছে। তাতে লেখা আছে যে, পৃথিবীটা যখন হয়েছিল তখন সেটা তেলের মতো পাতলা ছিল, আর ফেনার মত সমূদ্রে ভেসে বেড়াত।

তখন নাকি মোটে তিনটি দেবতা ছিলেন। এই তিনটি মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি,—তাঁরা মারা গেলে আবার দশটি দেবতা হলেন।

এই দশটি দেবতার একজন ছিলেন 'ইজানাগী'; তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল 'ইজানামী'।

অন্য দেবতারা এঁদের দু'জনের হাতে একটা শূল দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই তেলের মতন জিনিসটা থেকে পৃথিবী তয়ের করো।'

ইজানাগী আর ইজানামী বললেন, 'আচ্ছা।' বলে তাঁরা সেই শূল দিয়ে সমুদ্রটাকে ঘাঁটতে লাগলেন। তারপর যখন শূল তুললেন, তখন তার মুখ বেয়ে যে জল পড়েছিল, তাই থেকে একটা দ্বীপ হল, তার নাম 'ওনগরো'। এই ওনগরো দ্বীপে একটি সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, তার ভিতরে ইজানাগী আর ইজানামী বাস করতে লাগলেন। সেইখানে থেকেই তাঁরা জাপান দেশটাকে গড়ে ছিলেন। এই

দেশকে আমরা বলি ‘জাপান’, কিন্তু সে দেশের লোকেরা বলে ‘নিপ্পন’ বা ‘দাই-নিপ্পন’।

ইজানাগী আর ইজানামীর অনেক ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে ‘আগুন দেবতা’ একজন। এই দেবতার জন্মের সময় ইজানামী মরে গেলেন। তখন মনের দুঃখে ইজানাগী চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর সেই চোখের জল থেকে কান্না-পরীর জন্ম হল। কাঁদতে কাঁদতে শেষে ইজানাগীর রাগ হল। তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে আগুন-দেবতার মাথা কেটে ফেললেন, তাতে সেই কাটা দেবতার শরীর আর রক্ত হতে ষোলোটা দেবতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইজানাগীর মনের দুঃখ তাতেও ঘুচল না। শেষে তিনি ইজানামীকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পাতালে উপস্থিত হলেন,—সেই যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যেতে হয়। পাতালের ভিতর অস্ত পুরী আছে, সেই পুরীর দরজায় গিয়ে ইজানামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ইজানামী তাঁকে বললে, ‘একটু দাঁড়াও আমি জিজ্ঞাসা করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাব।’ এই বলে ইজানামী ভিতরে গেলেন। ইজানাগী খানিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন শেষে ইজানামীর দেরি দেখে তিনিও ভিতরে গেলেন। ভিতরে যেতেই এমনি ভয়ানক গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগল যে কী বলব। এমন ভয়ংকর নোংরা জায়গার কথা কেউ ভাবতেও পারে না ; আর সেখানে থেকে থেকে ইজানামীও এমন নোংরা হয়ে গিয়েছেন যে তাঁর কাছে যাবার সাধ্য নাই। এসব দেখে ইজানাগী নাকে হাত দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালেন। পেয়াদাগুলো তাঁকে পালাতে দেখে ‘ধর ধর’ বলে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি।

কী বিষম গন্ধই সে জায়গায় ছিল, দেশে ফিরেও ইজানাগীর গা থেকে সে গন্ধ গেল না। গন্ধে অস্থির হয়ে তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর কাপড় আর গা থেকে অনেকগুলি দেবতা বেরিয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে একটি মেয়ে ইজানাগীর বাম চোখ দিয়ে বেরিয়ে-

ছিলেন, সেটি এমন সুন্দর যে তেমন আর কেউ কখনো দেখেনি। সেই মেয়েটির নাম 'গগন আলো', তিনি সূর্যের দেবতা !

ইজানাগীর ডান চোখ দিয়ে আর একটি সুন্দর দেবতা বেরিয়েছিলেন, সেটির নাম 'তেজবীর'।

তখন ইজানাগী তাঁর নিজের গলার হার গগন-আলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা, তুমি হলে স্বর্গের রাণী।'

চন্দ্রপতিকে তিনি বললেন, 'তুমি হলে রাত্রির রাজা।' আর তেজবীরকে বললেন, 'তুমি হলে সমুদ্রের রাজা।' তখন গগন-আলো গিয়ে স্বর্গের রাণী হলেন, চন্দ্রপতি গিয়ে রাত্রির রাজা হলেন। কিন্তু তেজবীর সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলেন। দিন নাই, রাত নাই, কেবলই গালে হাত দিয়ে কান্না। তাঁর দাড়ি লম্বা হয়ে ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেকল, তবুও তাঁর কান্না থামল না।

ইজানাগী বললেন, 'আরে তোর হল কী? রাজ্য দিলাম, রাজ্যে গেলি না, খালি যে কাঁদছিস্?'

তেজবীর বললেন, 'আমি রাজ্য চাই না। আমি সেই পাতালে আমার মার কাছে যাব।'

ইজানাগী বললেন 'তবে যা বেটা তুই এখান থেকে দূর হয়ে।' বলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন তেজবীর স্বর্গে গিয়ে গগন-আলোর কাছে উপস্থিত হলেন। গগন-আলো জানতেন, তাঁর মন ভালো নয়, কাজেই তিনি তাঁকে দেখে ভাবলেন, 'না-জানি কেন এসেছে!'

তেজবীর কিন্তু বললেন, 'বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই মার কাছে চলেছি। যাবার আগে তোমাকে দেখতে এলাম।'

গগন-আলো বললে, 'তাই যদি হয়, তবে তোমার তলোয়ারখানা দাওতো।'

তেজবীরের কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে গগন-আলো সেটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। সেই গুঁড়ো থেকে তিনটি দেবতা জন্মাল।

তখন তেজবীর বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার গহনাগুলি দাওতো।' গহনা নিয়ে তিনি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন, আর সেই গুঁড়ো থেকে পাঁচটি দেবতা হল।

এখন, এই যে সব দেবতা হল, এরা কার? গগন আলো বললেন, 'তোমার তলোয়ার থেকে যারা হয়েছে, তারা তোমার, আর আমার গহনা থেকে যারা হয়েছে, তারা আমার।'

কথাটা তো বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু হলে কী হয়, গগন-আলোর গহনা থেকেই যে বেশী দেবতা হয়েছিল, কাজেই সে কথা তেজবীরের পছন্দ হল না। তাতে তিনি বিষম চটে গিয়ে গগন-আলোর ক্ষেত মাড়িয়ে, খাল বুজিয়ে, বাগান ভেঙে, বিষম দৌরাত্মি আরম্ভ করলেন।

পর্বতের গুহার ভিতরে নিজের ঘরে বসে সখীদের নিয়ে গগন-আলো কাপড় বুনছিলেন, সেই ঘরের ছাত ভেঙে তেজবীর ভিতরে ছাল-ছাড়ানো মরা ঘোড়া ফেলে দিলেন।

কাজেই তখন আর গগন-আলো কি করেন, তিনি তেজবীরের ভয়ে গুহার দরজা বন্ধ করে দিলেন। এখন তিনিই হলেন সূর্যের দেবতা, আলোর মালিক, সেই আলোর মালিক যখন গুহায় লুকোতে গেলেন, তখন কাজেই জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

সকলে বলল, 'সর্বনাশ! এখন উপায়?' তখন তারা করল কি, তারা সবাই মিলে অনেক যুক্তি করে একখানা চমৎকার আরসি তয়ের করল, আর যারপরনাই সুন্দর একছড়া মণির মালা গড়াল, আরো কত কী জিনিস খুঁজে নিয়ে এল। সেই সব জিনিস আর সেই আরসি আর সেই মালা দিয়ে গগন-আলোর পূজা করে, তারপর তারা হেসে, গেয়ে নেচে, লাফিয়ে, চেঁচিয়ে, মোরগ ডাকিয়ে, কী যে একটা সোরগোল জুড়ে দিল, তা না শুনলে বোঝা যায় না।

গুহার ভিতর থেকে সেই গোলমাল শুনে গগন-আলো ভাবলেন, 'না জানি কি হয়েছে।' তিনি আস্তে আস্তে গুহার দরজা একটু

ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে তোরা কিসের এত গোলমাল করছিস ?'

তারা বলল, 'গোলমাল করব না ? দেখো এসে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর একটি মেয়ে পেয়েছি !' বলেই সেই আরশি খানা এনে তাঁর সামনে ধরল।

সেই আরশির ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখে আর সূর্যের দেবতা লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি ছুটে বেরিয়ে এলেন—আর অমনি সকলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

তখন আবার সূর্য উঠল, আবার আলো হল, আবার সংসারে সুখ এল। তারপর সবাই মিলে সেই দুষ্ট তেজবীরকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।

সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, তেজবীর ঘুরতে ঘুরতে হী নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেখানে দুটি বুড়োবুড়ী একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে বসে কাঁদছিল, তাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন ? কী হয়েছে ?'

বুড়োটি বলল, 'বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনে কী করবে ? আমার আটটি মেয়ে ছিল, তার সাতটি অজগরে খেয়েছে, এই একটি আছে। সে বড় ভয়ঙ্কর অজগর, তার আটটি মাথা। বছরে একবার করে আসে, আর আমার একটি মেয়েকে খেয়ে যায়। আবার তার আসবার সময় হয়েছে, এবারে এটিকেও খাবে। তাই আমরা কাঁদছি।'

তেজবীর বললেন, 'এই কথা ? আচ্ছা তোমাদের কোনো চিন্তা নাই। আমি যা বলছি, তাই করো। আট জালা খুব কড়া রকমের সাকী (জাপানী মদ) তয়ের করো তো। করে, ঐ জায়গায় রেখে দাও, তারপর দেখো কী হয়।'

বুড়ো সেই দিনই আট জালা সাকী তয়ের করে তেজবীরের কথামত সাজিয়ে রেখে দিল ঃ সাকীর গন্ধে চারিদিক ভুর ভুর

করতে লাগল। ঠিক সেই সময় অজগর লেজ নাড়াতে নাড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর, সকলের আগে সেই সাকীর গন্ধ গিয়েছে তার নাকে। আর কি সে বেটা তার লোভ সামলাতে পারে? সে অমনি আট জালায় আট মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে সাকী খেতে লাগল। খেতে খেতে তার চোখ বুঁজে এল, মাথা ঢুলে পড়ল; তবু হুঁশ নাই, সে চোঁ চোঁ করে খাচ্ছে। শেষে ঘুমে অচেতন হয়ে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তা দেখে তেজবীর বললেন, 'আর কী? এই বেলা!' বলেই তিনি তার তলোয়ার নিয়ে এসে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। তার লেজটা কিন্তু ভারি শক্ত ঠেকল। কিছুতেই কাটা গেল না, বরং তাঁর তলোয়ারই ভেঙে পড়ে গেল। তখন তেজবীর খুঁজে পেলেন যে সেই লেজের ভিতরে আশ্চর্য রকমের একখানা তলোয়ার রয়েছে। তিনি তখনি সেই তলোয়ার খানা বার করে নিলেন।

তখন তো সকলেরই খুব সুখ হল। তারপর বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করে, সেই দেশে সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, দুজনে সুখে বাস করতে লাগলেন। আর সেই বাড়িতে যারপর নাই তাদের যত্নে থেকে বুড়োবুড়ীরও শেষকাল খুব আরামেই কাটল।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর ছিল তিন ছেলে; দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বললেন, 'দাদা, চলো না, তোমার কাজটি আমি করি, আর আমার কাজটি তুমি করো,—দেখি কেমন হয়।' বলে, নিজের তীরধনুক দাদাকে দিয়ে, দাদার বঁড়শি আর ছিপ তিনি চেয়ে নিলেন। নিয়ে মাছ তো ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বঁড়শিটা মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

তারপর একদিন দীপ্তানল বললেন, 'ভাই, সখ কি মিটেছে? এখন কেন আমার বঁড়শি আবার আমাকে ফিরিয়ে দাও না।' তাতে

তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বললেন যে, 'দাদা, বঁড়শি তো মাছে নিয়ে গেছে এখন কী করে দিই?' এ কথায় দীপ্তানল যারপর নাই রেগে বললেন যে, 'সে আমি জানি না; আমার বঁড়শি আমাকে এনে দাও।'

তখন তৃপ্তানল আর কী করেন, নিজের তলোয়ারখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাই দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠল না; তিনি বললেন, 'ও আমি চাই না; আমার বঁড়শি নিয়েছ তাই এনে আমাকে দাও।'

তৃপ্তানল হাজার বঁড়শি এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হল না। দীপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার সেই বঁড়শিটি আমাকে এনে দিতে হবে।' তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, 'হায় হায়! এখন আমি কী করি? সমুদ্রের মাছে বঁড়শি নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?'

এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদছেন। এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী হয়েছে বাছা? তুমি কাঁদছ কেন?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসে ছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আরও কত কাঁটা তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি নিলেন না, বললেন, আমার সেইটে এনে দাও। এখন আমি কী করি?' লবণেশ্বর বললেন, 'তুমি কেঁদো না, আমি যা বলছি তাই করো।' বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তয়ের করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর বললেন, 'এই নৌকায় চড়ে তুমি এই পথ দিয়ে যেতে থাকবে। খানিক দূর গিয়ে মাছের আঁশ দিয়ে গড়া একটা বাড়ি দেখতে পাবে, সেইখানে সমুদ্রের রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ির পাশে, বাগানের ভিতরে কূয়োর ধারে একটা বড় গাছ আছে, তার আগায় উঠে তুমি বসে থাকবে। সেই বাগানে রাজার

মেয়ে বেড়াতে আসে, সে তোমাকে তোমার বঁড়শির কথা বলে দেবে।'

একথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়িতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিকবাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এল। এসে তারা দেখল যে গাছের উপরে কেমন সুন্দর একটি রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বললেন, 'হ্যাঁ মা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে দেবে?' দাসীরা অমনি সোনার গেলাসে জল এনে তাঁকে খেতে দিল। তিনি তা থেকে একটুখানি জল খেলেন। তারপর গেলাস ফিরিয়ে দেবার সময়ে নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখতে পায়নি, তারা সেই মণিসুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তারপর রাজার মেয়ে জল খাবার জন্য গেলাস খুঁজতে এসে বললেন—'একী? গেলাসের ভিতর মণি কোত্থেকে এল রে?' দাসীরা বলল, 'তাতো আমরা জানি না, কুয়োর ধারে একটি রাজপুত্র বসে আছে। সে আমাদের কাছে জল খেতে চাইল, আমরা এই গেলাসে করে নিয়ে তাকে জল খেতে দিলাম। মণি হয়তো তারই নিজের হবে।'

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বললেন। রাজা সিন্ধুপতিও একথা শুনেই তাড়াতাড়ি সেই কুয়োর ধারে চলে এলেন। এসে সেই গাছের উপরে তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যারপর নাই আশ্চর্য আর খুশী হয়ে বললেন, 'আরে তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রাণী গগন-আলোর নাতির ছেলে! তুমি কেন কুয়োর ধারে বসে থাকবে বাবা? এসো এসো, ঘরে এসো!' বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে রাজা তাঁকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁকে সেলাম করে জোড় হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাজা অনেক ধুমধাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তারপর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন, তৃপ্তানল কেমন আছেন, রাজার মেয়ে বলেন, 'বেশ ভালো আছেন।' এমনি করে তিন বৎসর চলে গেল। তারপর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিছানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি কেন নিশ্বাস ফেলেছিলে? তোমার কিসের দুঃখ?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বঁড়শি মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে সেই বঁড়শি তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না।' শুনে রাজা বললেন,' 'এই কথা? আচ্ছা,—ডাক্ তো রে সকল মাছকে!' রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ সকলে এসে তাঁর কাছে হাজির হল, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো তো, তোমাদের কার গলায় সেই বঁড়শি আটকে ছিল?' তারা সকলে বললে যে, 'তাই মাছের গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।' তখন রাজামশায় তাইকে বললেন, 'হাঁ কর্ ব্যাটা, দেখি তোর গলায় কী আছে!' একথায় তাই যেই 'অ-অ-অ-আ-ক্!' করে দুহাত চওড়া হাঁটি করেছে, অমনি দেখা গেল যে ঠিক সেই বঁড়শিটি তার গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটি দিয়ে সেটাকে বার করে আনা হল। তখন তো আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমাই রইল না। রাজামশাই তাঁর হাতে সেই বঁড়শিটি দিয়ে আরো দুটি মাণিক তাঁকে দিলেন! তার একটির নাম জোয়ার-মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সমুদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটির নাম ভাটা-মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

তারপর কুমিরের রাজাকে ডেকে সিন্ধুপতি বললেন, 'তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। দেখো যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়।'

সেই পাহাড়ের মতো কুমির তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে

পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর দীপ্তানলকে তাঁর বঁড়শি ফিরিয়ে দিতে আর বেশীক্ষণ লাগল না। কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বঁড়শি পেয়ে খুশী হবেন, না তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাটতে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কী করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার-মাণিককে ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই তো সমুদ্রের জল পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তখন আর তিনি যাবেন কোথায়? ঢক ঢক জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'রক্ষে করো ভাই! আমার ঘাট হয়েছে, আমি আর অমন করব না।' সে কথায় তৃপ্তানল ভাটা-মাণিক ছুঁড়ে জল সরিয়ে তাঁকে বাঁচালেন।

তারপর থেকে দীপ্তানল ভালো মানুষ হয়ে গেলেন, আর ছোট ভাইকে রাজ্য ছেড়ে দিলেন।

ঘ্যাঘাসুর

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে। একটি দিনের জন্যেও ভাল থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ খেয়ে ভাল হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিনই রোগা হইতেছে। এত ধন জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়ঃ এর মধ্যে একদিন এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজ তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভাল হইবে।"

একটি লেবু! সে কোন্ লেবুটি, কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথা জানাইয়া দিলেন যে, 'যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে। আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন ঝুনাকিলের কথা এই যে, সে রাজ্যে লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষীর বাড়িতে একটি লেবুর গাছ আছে; চাষী অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট, হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর তাহাতে লেবু হইয়াছে। লেবু তো নয় যেন রসগোল্লা! এক একটা বড় কত! যেন এক একটা বেল! তেমন লেবু তোমরা দেখও নাই, খাও-ও নাই। আমি দেখিতে পাই নাই; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষীর তিন ছেলে; যদু গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম শুনিয়া চাষী যদুকে একঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল যে, শিগ্‌গির এগুলি রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।'

যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে এক হাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকাটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ঝুড়িতে কি ও? যদু বলিল, 'ব্যাঙ।' সেই লোকটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজার দারোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যারপরনাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা মহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন; আর অমন চারিটি ব্যাঙ তাহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল,

সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে বাড়ি ফিরিল। তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এরপর চাষী আর এক ঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই এক হাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল, 'ঝিঙের বীচি,' একহাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়ির দারোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই। তাহারা বলিল যে, 'তোরই মতন একটা সেদিন এসে রাজা মশাইয়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে গেছে। তুই আবার একটা কি ক'রে বসবি কে জানে!' অনেক পীড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতে পার। সাজাটাও তার তেমনিই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে কাজেই তাহাকে আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ি পাঠাইতে কেহ বলিল না। কিন্তু সে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষী তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও একঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই এক হাত লম্বা মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল। এক হাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাসা করিল, ঝুড়িতে কি ও? মানিক বলিল, 'ঝুড়িতে লেবু আছে; তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।' এক হাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যারপরনাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাত-জোড়ের পর দারোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, 'দেখিস, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বীচি-টিচি হয় না। তাহলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।'

যাহা হউক মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল! রাজা মহাশয় তো খুবই খুশী! তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কেমন হয়, আমাকে খবর দিস্!' খবরের আশায় রাজা মহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত! সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে!

ইহাতে রাজা মহাশয় যারপরনাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই ভাবিতে লাগিল—'তাই তো, করিয়াছি কি। এখন

যে চাষীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হয়!' এই ভাবিয়া রাজা মহাশয় স্থির করিলেন যে, চাষীর ছেলেকে যেমন করিয়াই হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে যে, 'এর পরই বুঝি মেয়ের বিয়ে দিবে।' এমন সময় রাজা মহাশয় তাহাকে বলিলেন, 'বাবু, তুমি কাজটা বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ করা সহজ কথা নয়। আগে, আর একখানা কাজ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙ্গায়ও তেমনি চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া না দিতে পারিলে, তোমার কোন আশাই নাই।'

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। তারপর আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে নেহাত বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, মান্‌কে যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা করিলেই যে-সে তয়ের করিতে পারে।

যদু একখানা কুড়াল লইয়া তখনই নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেইদিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে; পরিশ্রমেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। 'কিহে যদুনাথ, কি হচ্ছে?' 'গামলা'। 'আচ্ছা, তাই হোক।'

'তাই হোক' বলিয়া একহাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল; যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সেই সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মত গোল হইয়া ওঠে, নৌকার মতন কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল, কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছু তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেস। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তিন চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি ফিরিল, এমন ভাল

গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল, আর সেই একহাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উঁচুদরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

অবশ্য, এরপর মানিক নৌকা গড়িতে গেল, আর তাহাকেও সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে?' মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল—'জলে যেমন চলে ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গড়ে দিতে পারলে, রাজা মশাই বলেছেন, মেয়ে বিয়ে দেবেন। এই কথা শুনিয়া একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। একহাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই; অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজা-রাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি-তাকিয়ার তাহার ভিতরটা সাজানো। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর, তা কি বলিব। যে জিনিসে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয়; আমি তাহার নাম জানি না।

রাজামহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেইখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপ গুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজামহাশয় খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মানিককে বলিলেন, 'এতেও হচ্ছে না; আর একখানা কাজ করে দিতে হবে। এক গাছ ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক হইলে আমার মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি আনিয়া দিলে নিশ্চয় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে।' মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখী, খানিকটা জানোয়ার, বিদ্‌ঘুটে চেহারা খিট খিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে, অচেনা শহরে, সোনার পুরীতে বাস করেন, মানুষটিকে দেখিতে পাইলেই, রসগোল্লাটির মত টপ্‌ করিয়া গিলেন। সেই ঘ্যাঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঘাসুরের মুল্লুকের পথ জিজ্ঞাসা করে, আর ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারও বাড়িতে আশ্রয় লয়; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঘাসুরের মুল্লুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, 'বাপু, তুমি ঘ্যাঘাসুরের দেশে চলেছ শুনছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে! আমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি; ঘ্যাঘা তার কোন সন্ধান বলতে পারে কিনা, জিজ্ঞাসা কোরো তো।' মানিক বলল, 'আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসব।' আর একদিন সে আর এক বড়লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে; সেই বড়লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তার বেয়ারামটা যে কি কোনো ডাক্তার কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়লোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, 'আমার মেয়ের অসুখ কিসে সারবে এই কথাটা যদি ঘ্যাঘার কাছ থেকে জেনে আসতে পার, তবে বড় উপকার হয়।' মানিক বলল, 'অবিশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসব।'

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা নদীর নৌকা নাই, খেয়া নাই; এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহারি কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, 'বাপু, আমার এই দুঃখু কবে দূর হবে, ঘ্যাঘার কাছে

জিজ্ঞেস কোরো তো! আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে ক'রে দিনরাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।' মানিক বলিল, 'তোমার কিছু ভয় নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করব।'

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঘা তখন বাড়ি ছিল না; ঘেঁঘী ছিল। ঘেঁঘী তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'পালা বাছা, শিগ্‌গির পালা। ঘ্যাঘা তোকে দেখতে পেলেই গিলবে।' মানিক বলিল, 'আমি যে ঘ্যাঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে কেমন ক'রে যাব? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে সেই চাবিটি কোথায় আছে? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার ক'রে দিলে, সে বাড়ি যাবে কেমন ক'রে?'

ঘেঁঘী বলিল, 'প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই, আর তাকে একশ খবর বলে দাও। তুই কেরে বাপু?' মানিক বলিল, 'আমি মানিক, পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না; এক গাছি পালক আমার চাই।'

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, 'আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক্। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন। মানিক ঘ্যাঘার খাটের তলায় রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঘার মেজাজটা বড়ই খিট খিটে; সবটাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ—মানুষের গন্ধ। মানুষ দে, খাই।'

ঘ্যাঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু

সেটা ঘ্যাঘার নাম শুনিয়াই পলাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঘা কিছু শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের অগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে; লেজ

দেখিয়াই সে ঘ্যাচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঘা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 'ঘেঁঘী আমার লেজ ধরে যেন কে টানলে। হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ!'

ঘেঁঘী বলিল, 'তোমার ভুল হইয়াছে! অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ তো একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কাদের বাড়ির লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—'ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঘা বলিল, 'হাঁ হাঁ! সেই লোহার সিন্দুকের চাবি! আমি জানি। সেটাকে তাদের খোকা গদির ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।' ঘেঁঘী বলিল, 'আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ—।' অমনি ঘ্যাঘা বলিল, কোলা ব্যাঙে ওর চুল

নিয়ে গেছে ; ঘরের কোনেই তার গর্ত। ঔখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।' আবার ঘেঁঘী বলিল, 'যে লোকটা মানুষটা ঘাড়ে করে নদী পার করে—?' ঘ্যাঁঘা বলিল, 'সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না। তাহলেই তো সে বাড়ি যেতে পারে। যাকে নামিয়ে দেবে সেই মানুষ পার করতে থাকবে।'

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল ; ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এরপর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু হল ?' মানিক বলিল, সে হবে এখন, আগে পার কর ; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।' বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, 'এরপর এক জনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো ; তাহলেই তোমার ছুটি।' এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে ; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দুবার কাঁধে করে পার করি।' মানিক বলিল, 'তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের ; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।'

চারদিন চলিয়া মানিক, যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে ?' মানিক বলিল, 'হ্যাঁ।' এই বলিয়া সে ঘরের কোন হইতে কোলা ব্যাঙের গর্ত খুঁড়িয়া সেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে দুই বৎসর যাবৎ মড়ার মতন পড়িয়া ছিল, সে উঠিয়া হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশী হইল, তাহা কি বলিব ! মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাকাকড়ি দিল। এই সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজা মহাশয়কে ঘ্যাঁঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিকের যারপরনাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্যায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরি হওয়া উচিত নয়। রাজা মহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটতে লাগল। কিন্তু রাজা মহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন যে, 'ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমিও সেইখানে যাব।'

এই ভাবিয়া রাজামহাশয় ঘ্যাঁঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কারণ, অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাঁহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজামহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গালি দিতে লাগিলেন, তারপর হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কান দিবার অবসরই পায় নাই; ততক্ষণ সে ডাঙায় উঠিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি পানে ছুটিয়াছে, তাড়াতাড়ি রাজামহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেইখানেই মানুষ পার করিতেছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি কখনও ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিবেন। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া একথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

টুনটুনি আর রাজার কথা

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকুতে দিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা তার একটি টাকা তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিলে, আর ভাবলে 'ঈস্! আমি ত বড়লোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সেই ধন আছে!' তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে আর বলে—

রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরে সে ধন আছে!

রাজা তার সভায় বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁরে! পাখিটা কি বলছে রে?'

সকলে হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ, পাখি বলছে, 'আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!' শুনে রাজা খিল খিল করে হেসে বললেন, 'দেখতো ওর বাসায় কি আছে।'

তারা দেখে এসে বললে, 'মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা।'

তখনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কি করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

রাজা বড় ধন কাতর
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর!

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা তো বড় ঠ্যাটারে! যা ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরিয়ে পেয়ে টুনির বড় আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

রাজা ভারি ভয় পেল
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।

রাজা জিগগেস করলেন, 'আবার কি বলছে রে?' সভার লোকেরা বললে, 'বলছে যে মহারাজ নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনে তো রাজামশাই রেগে একেবারে অস্থির! বললেন, 'কি, এত বড় কথা! আন তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই!'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনল। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানীদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে!'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানীরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

একজন বললেন, 'কি সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাওতো একবার দেখি। বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার আর একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফসকে গিয়ে উড়ে পালাল।

কি সর্বনাশ! এখন উপায় কি হবে? রাজা জানতে পারলে রক্ষা থাকবে না।

এমনি করে তাঁরা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ থপ করে যাচ্ছে। সাতরানী তাকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ-চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে। এইটেকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন।'

সেই ব্যাঙটির ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভারি খুশি হলেন।

তারপর সবে তিনি সভায় বসেছেন, আর ভাবছেন, এবারে পাখির বাছাকে জব্দ করেছি।'

অমনি টুনি বলছে—

বড় মজা, বড় মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন! তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আর কত কি করেন। তারপর রেগে বললেন, সাতরানীর নাক কেটে ফেল।'

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাতরানীর নাক কেটে ফেললে।

তা দেখে টুনটুনি বললে—

এক টুনিতে টুন টুনাল
সাতরানীর নাক কাটাল!

তখন রাজা বললেন, 'আন বেটাকে ধরে! এবারে গিলে খাব! দেখি কেমন করে পালায়!'

টুনটুনিকে ধরে আনলে।

রাজা বললেন, 'আন জল!'

জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন।

সবাই বললে, 'এবারে পাখি জব্দ!'

বলতে বলতেই রাজামশাই ভোক্ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, 'গেল, গেল! ধর, ধর!' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে আবার বেচারাকে ধরে আনল।

তারপর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দু টুকরো করে ফেলবে।

এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগল!

খানিকবাদে রাজামশাই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক!' অমনি টুনটুনিকে সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরেরও সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বললে, 'সিপাই, সিপাই! মারো, মারো! পালালো!'

সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায় না পড়ে, রাজামশায়ের নাকে গিয়ে পড়ল।

রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এল, ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

নাক-কাটা রাজারে
দেখ তো কেমন সাজারে!

বলেই সে উড়ে সে দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এল দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

জোলা আর সাত ভূত

এক জোলা ছিল, সে পিঠে খেতে বড় ভালবাসত।

একদিন সে তার মাকে বলল, 'মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে পিঠে করে দাও।'

সেইদিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল-গোল, চ্যাপটা-চ্যাপটা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুশি হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব !'

জোলার মা বলল, 'খালি নাচবিই যদি, তবে খাবি কখন ?'

জোলা বলল, 'খাব কি এখানে ? সবাই যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে গিয়ে খাব।' ব'লে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব !'

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছতলায় চলে এল, যেখানে হাট হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচছে আর বলছে,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব !'

এখন হয়েছে কি,—সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত ! জোলা 'সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব' বলছে, আর তা শুনে তাদের তো বড্ডই ভয় লেগেছে। তারা সাতজনে গুটিশুটি হয়ে কাঁপছে, আর বলছে, 'ওরে সর্বনাশ হয়েছে ! ঐ দেখ, কোত্থেকে এক বিটকেল ব্যাটা এসেছে, আর বলছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে ! এখন কী করি বল তো '

অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে জোড়হাত করে তাকে বলল, 'দোহাই কর্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি, এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন!'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মূলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ,—তারা জোলার সামনে এসে কাঁইমাই করে কথা বলছে দেখেই তো সে এমনি চমকে গেল যে সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বলল, 'হাঁড়ি নিয়ে আমি কী করব!'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।'

জোলা বলল, 'বটে! আচ্ছা আমি পায়েস খাব!'

বলতে বলতে সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগল! তেমন পায়েস জোলা কখনও খায়নি, তার মাও খায়নি, তার বাপও খায়নি। কাজেই জোলা যারপরনাই খুশি হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে! তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কী করে বাড়ি যাব? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এবেলা সেইখানেই যাই; তারপর বিকেলে বাড়ি যাব এখন।'

বলে সে তো তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁড়ি কোত্থেকে আনলি রে?'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ।'

বন্ধু বলল, 'বটে? আচ্ছা দেখি তো কেমন গুণ।'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করে দিতে পারি।'

বন্ধু বলল, 'আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া, পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর, জিলিপি, অমৃতি, বরফি, চমচম এইসব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বলছে, জোলা হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এসব দেখে তার বন্ধু ভাবল যে এ জিনিসটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন সে জোলাকে কতই আদর করতে লাগল। পাখা এনে

তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কী কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম বেয়ে পড়েছে! একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দেব?'

সত্যি সত্যিই জোলার তখন ঘুম পেয়েছিল; কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা, বিছানা করে দাও।'

তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদ্‌লে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর তার মাকে বলছে, 'দেখো মা, কী চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি। তুমি কি খাবে মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখো আমি এর ভিতর থেকে সেসব বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তু এ তো আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে-সব জিনিস বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা ব'নে গেল, তার মা তাকে বকতে লাগল।

তখন তো জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে 'সেই ভূত ব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, একথা তার মনেই হল না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে বলতে লাগাল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাতজোড় করে বলল' 'মশাই গো। আপনার পায়ে পড়ি, এই ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না।'

জোলা বলল, 'ছাগলের কি গুণ?'

ভূতরা বলল, 'ওকে সুড়সুড়ি দিলে ও হাসে, আর ওর মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'

অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর

ছাগলটাও 'হিহি হিহি' করে হাসতে লাগল। তার মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে তো আর হাসি ধরে না। সে ছাগল নিয়ে ভাবল যে এ জিনিষটি বন্ধুকে না দেখালেই নয়।

সেদিন তার বন্ধু তাকে আরো ভাল বিছানা করে দিয়ে দুহাতে দুই পাখা নিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল না। তার বন্ধু তো এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরি ক'রে তার জায়গায় আর একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল ; এসে দেখল যে তার মা তার দেরি দেখে ভারি চটে আছে! তা দেখে সে বলল, 'রাগ আর করতে হবে না, মা ; আমার ছাগলের গুণ দেখলে খুশী হয়ে নাচবে!' বলেই সে ছাগলের বগলে আঙ্গুল দিয়ে বলল, 'কাঁতু কুঁতু কুতু কুতু কুতু!!!'

ছাগল কিন্তু ওতে হাসলো না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, কাঁতু কুঁতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!'

তখন সেই ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে এমনি বিষম গুঁতো মারল যে সে চিত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমন বকুনি দিল যে তেমন বকুনি সে আর খায়নি!

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কি বলব। সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

বেটারা আমাকে দুবার দুবার ফাঁকি দিয়েছিস, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেঁতলা করে দিয়েছিস,—আজ আর তোদের ছাড়ছি নে!

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি মশাই, আমরা কী করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই বা কী করে আপনার নাক থেঁতলা করলুম ?'

জোলা তার নাক দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না, গুঁতো মেরে সে আমার কী দশা করেছে। তোদের সব কটাকে চিবিয়ে খাব !'

ভূতেরা বলল 'সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন ?'

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তারপর বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই তো হয়েছে ! আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় আপনার বন্ধু আপনার ছাগল চুরি করেছে।' একথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক। সে বেটাই আমার হাঁড়িও চুরি করেছে, ছাগলও চুরি করেছে। এখন কী হবে ?'

ভূতেরা তাকে একগাছি লাঠি দিয়ে বলল, 'এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দেবে, ছাগলও এনে দেবে। ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে গিয়ে বলবেন, 'লাঠি লাগ তো !' তা হলে দেখবেন, কী মজা হবে। লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দেবে।'

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, একটা মজা দেখবে ?'

বন্ধু তো ভেবেছে না জানি কী মজা হবে। তারপর যখন জোলা বলল, 'লাঠি, লাগ তো !' তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখেনি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পিটতে পিটতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাতজোড় করে বলল, 'তোর পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাঁড়ি নে, তোর ছাগল নে, আমাকে ছেড়ে দে !'

জোলা বলল, 'আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন্, তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধুমশাই আর কী করেন? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির করলেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আসুক তো!' অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চার-শটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি, হাতি-ঘোড়া—খাওয়া পরা, চাল-চলন, লোকজন, সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যারপরনাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারী কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুটে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, 'ভাই, এখন কী করি বল্ তো? বেঁধেই ও নেবে দেখছি।'

জোলা, বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে তার লাঠিটা বগলে করে রাজার সিংহ দরজার বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতী ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধূলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতি চড়ে সকলের আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুটে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ তো।' আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতী ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর পিটুনি যে কেমন দ্বল সে যারা সে পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে।

শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুটেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কী হুকুম হয়?'

রাজামশায়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিলে। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায় পড়ে মাপ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তাহলে তোমাকে মাপ করব।'

সে তো তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজী হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে তবে হয়তো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।

জোলা বলল, 'আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন্, তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধুমশাই আর কী করেন ? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির করলেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আস্থক তো!' অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে স্থড়স্থড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চার-শটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি, হাতি-ঘোড়া—খাওয়া পরা, চাল-চলন, লোকজন, সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যারপরনাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারী কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুটে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, 'ভাই, এখন কী করি বল্ তো ? বেঁধেই ও নেবে দেখছি।'

জোলা, বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে তার লাঠিটা বগলে করে রাজার সিংহ দরজার বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতী ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধূলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতি চড়ে সকলের আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুটে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ তো।' আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতী ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর পিটুনি যে কেমন দিল সে যারা সে পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে।

শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুটেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কী হুকুম হয়?'

রাজামশায়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিলে। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায় পড়ে মাপ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তাহলে তোমাকে মাপ করব।'

সে তো তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজী হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে তবে হয়তো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।

ফিঙে আর কুঁক্‌ড়ো

একটা দানব ছিল, তার নাম ছিল ফিঙে ; সে দেড়শো হাত লম্বা শালগাছের ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াত। আরেকটা দানব ছিল, তার নাম কুঁকড়ো। সে ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেঁতলা করে দিত।

আর যত দানব ছিল, তাদের সকলেই কুঁকড়ো ঠেঙিয়ে ঠিক করে দিয়েছে, এখন সে ফিঙের সন্ধানে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। একথা শুনে অবধি ফিঙের আর ঘুম হয় না, কাজেই সেও কুঁকড়োকে এড়াবার জন্য খালি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। ফিঙে সমুদ্রের ধারে গেল, তা শুনে কুঁকড়ো সেই দিক পানে রওনা হল। সে খবর পেয়েই ফিঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তার নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরখানি ছিল একটা উঁচু পর্বতের উপর ; সেখান থেকে দশ দিনের পথ অবধি দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই ফিঙে ভাবল যে ওখানে গেলে কুঁকড়ো নিতান্ত আচমকা এসে তাকে মারতে পারবে না। ফিঙেকে অমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখে তার স্ত্রী উনা বলল 'কী হয়েছে?' ফিঙে আঙুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ কুঁকড়ো আসছে! বেটা ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেঁতলা করে দেয়। এবারে দেখছি ভারী বেগতিক।'

উনা সেদিকে দেখল, সত্যি সত্যিই কুঁকড়ো আসছে, কিন্তু এখনও সে ঢের দূরে, তিন-চার দিনের কমে এসে পৌঁছবে না। তখন সে ফিঙেকে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। তুমি পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকো, আমি কুঁকড়োকে ঠিক করে দিচ্ছি।' কিন্তু ফিঙের মনের ভয় তাতে গেল না। সে মাথা হেঁট করে বসে কত কথাই ভাবতে লাগল।

উনা কিন্তু ততক্ষণে চুপ করে ছিল না। সে গ্রামের লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যার ঘরে যত ভাঙা দা, কুড়ুল, কাস্তে খন্তা কোদাল, হুড়কো ছিটকিনি আর হাতুড়ি আর পেরেক ছিল, সব চেয়ে ঝুড়ি

ভরে নিয়ে এল। তারপর সেইগুলো ভিতরে পুরে পুরে সে দুদিন ধরে খালি পাটিসাপটাই তয়ের করল। ফিঙে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আর বলে, 'ও কী করছ?' উনা বলে, 'যাই করি না কেন,—তুমি চুপ করে থাকো।'

পিঠে হয়ে গেলে উনা তিনি গামলা ছানাও তয়ের করল। তারপর ফিঙেকে অনেক পরামর্শ দিয়ে, অনেক সন্ধান শিখিয়ে রেখে, সে সব ঠিকঠাক করে রাখল। এখন কুঁকড়ো এলেই হয়।

পরদিন দুপুরবেলায় কুঁকড়ো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসেই ভয়ংকর গর্জনে আকাশপাতাল কাঁপিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ফিঙে কোথায়?' উনা বলল, 'সে তো বাড়ি নেই। কুঁকড়ো বলে নাকি একটা ছোকরা তাকে খুঁজতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ভারী বড়াই করছিল, তাই শুনে ফিঙে বিষম রেগে লাঠি হাতে তাকে মারতে বেরিয়েছে। যদি তাকে দেখতে পায় তবে আর বেচারাকে আস্ত রাখবে না।'

তা শুনে কুঁকড়ো ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আমিই তো কুঁকড়ো, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি।' সে কথায় উনা হো হো করে হেসেই কুটিপাটি। তারপর অনেকক্ষণ নাক সিঁটকিয়ে কুঁকড়োর পানে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এই টিকটিকির মত জোয়ানটি হয়ে তুমি ফিঙের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অমন কাজও করতে নাই বাছা। কেন ফিঙের হাতে প্রাণ দেবে? আমার কথা শুনে চলো, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ একটা কাজ কর দেখি; বড্ড হাওয়া আসছে, ফিঙে বাড়ি নেই, কে ঘরখানিকে ঘুরিয়ে দেবে? দেখো তো তুমি পার কিনা।'

কুঁকড়ো ভাবলো, 'বাবা! হাওয়া থামাতে হলে ফিঙে এই ঘরটাকে ঘুরিয়ে দেয় দাকি ?, এখন আমি যদি "না" বলি তবে তো দেখছি আমার বড্ড নিন্দে হবে।' তখন সে আগে খুব করে তার ডান হাতের মাঝের আঙুলটা মটকে নিল। আঙুলটাতেই তার যত জোর ছিল, ওটি না হলে সে কিছুই করতে পারত না। আঙুল

মটকানো হয়ে গেলে সে দুহাতে ঘরখানিকে জড়িয়ে ধরে তাতে এমনি পাক দিল যে দেখতে দেখতে পাহাড়ের চূড়া সুদ্ধ ঘরখানি ঘুরে গেল।

এতক্ষণ ফিঙে কী করছে? সে উনার পরামর্শে তার নিজের খোকা সেজে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, আর কুঁকড়োর কাণ্ড দেখে সেই কাঁথার ভিতরে ভয়ে ঘেমে আর কেঁপে অস্থির হচ্ছে।

এদিকে উনা আবার কুঁকড়োকে বলল, 'বেশ বাপু! লক্ষ্মী ছেলে তুমি। আহা! ঘরে এক ফোঁটা জল নেই, তোমাকে কী দিয়ে একটু মেঠাই খেতে দিই। পাহাড়টার নীচে জল থাকে, ফিঙে পাহাড় সরিয়ে তাই তুলে আনে। আজ তো সে বাড়ি নেই, এখন তার কী হবে? দেখো তো বাপু তুমি পাহাড়টা ঠেলে, একটু জল আনতে পার কি না!'

কুঁকড়ো আবার খুব করে তার আঙুল মটকে নিয়ে, সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে এমনি গুঁতো মারল যে তাতে দশহাত গভীর এক প্রকাণ্ড দীঘি হয়ে গেল, আর তাতে জলও হল তেমনি। তা দেখে উনা আর একটু হলেই 'মাগো!' বলে চেঁচিয়ে ফেলছিল, কিন্তু সে ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'চলো, এখন তোমাকে কিছু পিঠে খেতে দিই গে।'

এই বলে উনা কুঁকড়োকে ঘরে এনে দিয়েছে সেই পিঠে খেতে। সে বেটাও এমনি লোভী—একেবারে তার দশটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে। দিয়েই সে 'উঃ—হুঃ—হুঃ' বলে এমনি ভয়ংকর চেঁচিয়ে উঠল যে, তার একটু হলেই তাতে ঘরের ছাত উড়ে যেত। বেজায় ব্যস্ত হয়ে সেই পিঠে চিবোতে গিয়ে তার চারটে দাঁত ভেঙ্গে রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছে, কাজেই না চেঁচাবে কেন?

উনা তখন বলল, 'আরে, অত চেঁচিও না, খোকার ঘুম ভেঙে যাবে। আমি ভাবছিলাম তুমি জোয়ান লোক, ঐ পিঠে খেতে তোমার ভাল লাগবে। ফিঙে আর খোকা ও পিঠে খুব খায়।'

বলতে বলতে সেই খোকাটা কাঁথার ভিতর থেকে ষাঁড়ের মত

চেঁচিয়ে বলল, 'অঁ-য়্যা-া-া বদ্দ খিদে পেয়েথে !' পিতে থাব। খোকার গলার সে আওয়াজ শুনেই তো কুঁকড়োর পিলে চমকে উঠেছে। উনা
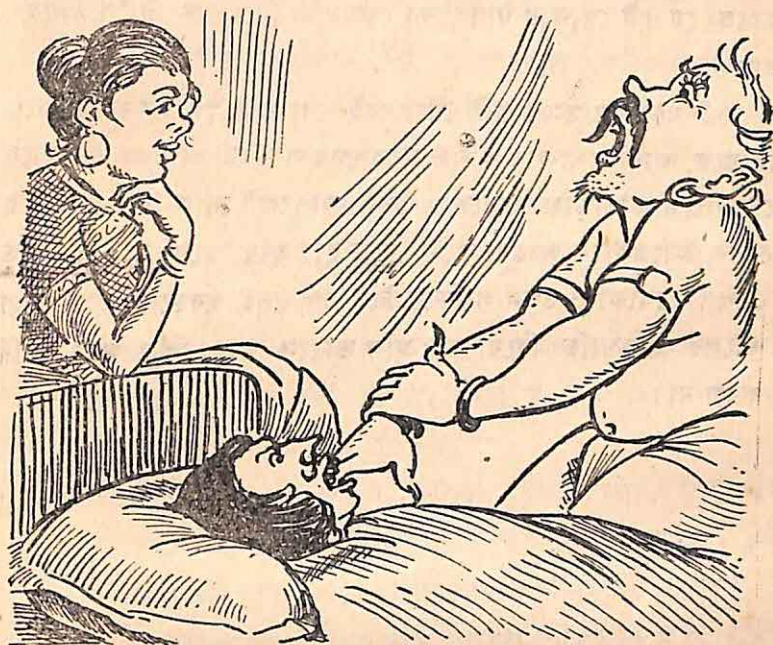
অবশ্য খোকার জন্য ভালো পিঠে করে রেখেছিল। তাই থেকে কয়েকটা খেতে দিল। কুঁকড়ো তো আর তা জানে না, সে দেখল, যাতে তার নিজের দাঁত ভেঙে গেছে, 'খোকা' তাই কপাকপ খাচ্ছে। কাজেই সে ভাবল, 'বাবা গো, খোকাই যদি অমনি পিঠে খেতে পারে তবে তার বাবা না জানি কী করতে পারে! ভাগ্যিস সে বেটা বাড়ি নেই।'

এমন সময় 'খোকা' আবার বলল, 'পাথল দে। দল বা'ল কব্ব!' উনা তার একতাল ছানা, আর কুঁকড়োকে একটা সাদা পাথর দিয়ে বলল, 'খোকার ঐ এক খেলা—পাথর চিপে জল বার করে। তুমিও একখানা পাথর টিপে দেখো তো।' কুঁকড়ো সেই পাথর প্রাণপণে টিপেও তা থেকে জল বার করতে পারল না। খোকার ছানা থেকে অবশ্য জল বার হতে লাগল। তা দেখে কুঁকড়ো ঠকঠক করে কাঁপতে

কাঁপতে বলল, 'ববা গো ! আমি এইবেলা পালাই। এই খোকার বাবা এলে আমাকে আস্ত রাখবে না। আমার খালি দেখতে ইচ্ছা করছে যে এই খোকার দাঁতগুলো কেমন যা দিয়ে সে ঐ পিঠেগুলো খায়।'

এই বলে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে যেই 'খোকা'র মুখ আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, অমনি খোকাও কটাস করে তার সব-কটি আঙুল একেবারে গোড়াসুদ্ধ কামড়িয়ে নিয়েছে। সেই আঙুলেই নাকি ছিল কুঁকড়োর জোর, কাজেই সে আঙুল কাটা যেতে হায় হায় করে মাটিতে পড়ে গেল। খোকা'ও তখন লাফিয়ে উঠে তার সেই দেড়শো হাত লম্বা শালের ছড়িগাছি দিয়ে তার হাড় ভাঙতে আর কিছু মাত্র দেরি করল না।

বানর রাজপুত্র

এক রাজার সাত রানী, কিন্তু ছেলেপিলে একটিও নেই। রাজার তাতে বড়ই দুঃখ ; তিনি সভায় গিয়ে মাথা গুঁজে বসে থাকেন, কেউ এলে ভাল করে কথা কন না।

একদিন হয়েছে কি এক মুনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মুনি রাজার মুখ ভার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা, তোমার মুখ যে ভার দেখছি ; তোমার কিসের দুঃখ ?'

রাজা বললেন, 'সে কথা আর কী বলব, মুনিঠাকুর! আমার রাজ্য ধন, লোকজন সবই আছে, কিন্তু আমার ছেলেপিলে নেই, আমি মরলে এসব কে দেখবে ?'

মুনি বললেন, 'এই কথা ? আচ্ছা, তোমার কোন চিন্তা নেই। কাল ভোরে উঠেই তুমি সোজাসুজি উত্তর দিকে চলে যাবে। অনেক দূর গিয়ে একটা বনের ধারে দেখবে একটা আমগাছ রয়েছে। সেই আমগাছ থেকে সাতটি আম এনে তোমার সাতরানীকে বেঁটে খাইয়ে দিলেই তোমার সাতটি ছেলে হবে। কিন্তু খবরদার, আম নিয়ে আসবার সময় পিছনের দিকে তাকিয়ো না যেন!'

এই কথা বলে মুনি চলে গেলেন। তারপর দিন গেল, রাত হল, ক্রমে রাত ভোর হল। তখন রাজামশাই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সোজাসুজি উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে তিনি দেখলেন, সত্যি সত্যি বনের ধারে একটা আমগাছ আছে, তাতে পাকা পাকা সাতটি আমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই বনে তিনি কতবার শিকার করতে এসেছেন, কিন্তু আমগাছ কখনও দেখতে পাননি। যা হোক, তিনি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে আম সাতটি পেড়ে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে চললেন।

খানিক দূরে যেতে না যেতেই শুনলেন, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে ডাকছে,

ওগো রাজা, ফিরে চাও,
আরো আম নিয়ে যাও।

মুনি যে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে কথা রাজার মনে ছিল না! তিনি পিছন থেকে ডাক শুনেই ফিরে তাকিয়েছেন, আর অমনি আমগুলো তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে আবার গাছে ঝুলতে লেগেছে। কাজেই রাজামশাই-এর আবার গিয়ে গাছে উঠে আমগুলি পেড়ে আনতে হল। এবার আর তিনি কিছুতেই মুনির কথা ভুললেন না। তিনি চলে আসবার সময় পিছন থেকে তাকে কত রকম করে ডাকতে লাগল, 'চোর' 'চোর' বলে কত গালও দিল। রাজামশাই তাতে কান না দিয়ে বোঁ বোঁ করে বাড়ী পানে ছুটলেন।

বাড়ী এসে রানীদের হাতে সাতটি আম দিয়ে রাজামশাই বললেন, 'তোমরা সাতজনে এই সাতটি আম বেঁটে খাও।'

ছোটরানী তখন সেখানে ছিলেন না। বড় রানীরা ছজনে মিলে তাঁকে কিছু না বলেই সব কটি আম খেয়ে ফেললেন। ছোটরানী এর কিছুই জানতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর ঝি সব দেখল। বড় রানীদের খাওয়া হয়ে গেলে সে আমের ছালগুলি চুপিচুপি কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই ছালগুলো ধুয়ে বেঁটে ছোটরানীর হাতে দিয়ে বলল, 'মা, এই ওষুধটা খাও, তোমার ভাল হবে।' ওষুধ খেতে হয়, তাই ছোটরানী আর কোন কথা না বলেই সেটা খেয়ে ফেললেন।

তারপর বড় রানীদের সকলেরই এক-একটি সুন্দর খোকা হল, রাজা তাতে খুশী হয়ে খুব ধুমধাম আর গানবাজনা করালেন। ছোটরানীরও একটি খোকা হল, কিন্তু সেটি হল বানর। বানর দেখে রাজা চটে গিয়ে ছোটরানীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেশের লোকের তাতে বড়ই দুঃখ হল। তারা একটি কুঁড়ে বেঁধে ছোটরানীকে বলল, 'মা, তুমি এইখানে থাকো।'

সেইখানে ছোটরানী থাকেন। বানরটি সেখানে থেকে দিন দিন বড় হচ্ছে। সে মানুষের মতো কথা কয়। আর তার এমনি বুদ্ধি যে, কোন কথা তাকে শিখিয়ে দিতে হয় না। যখন যে কাজের

দরকার, অমনি সে তা করে। সারাদিন সে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যে ফল দেখে তা খায়; খুব ভাল লাগলে মার জন্যে নিয়ে আসে। তাকে কেউ কিছু বলে না, কারুর গাছের ফল খেতে গেলে সে ভারী খুশী হয়ে ভাল ভাল ফল দেখিয়ে দেয়। তার বুদ্ধি দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়!

এমনি করে দিন যাচ্ছে। বড় রানীদের ছটি ছেলেও এখন বড় হয়েছে। তারা বানরটিকে যারপরনাই হিংসা করে, সে তাদের সঙ্গে খেলা করতে গেলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর একদিন বানরটি দেখল যে বড় রানীদের ছেলেদের জন্য মাস্টার এসেছে, তারা পুঁথি নিয়ে তার কাছে বসে পড়ে। তা দেখে বানর গিয়ে তার মাকে বলল, 'মা আমাকে পুঁথি এনে দাও, আমি পড়ব।'

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হায় বাছা, কী করে পড়বে? তুমি যে বানর।'

বানর বলল, 'সত্যি মা, আমি পড়ব; তুমি বই এনে দিয়েই দেখো। তুমি আমাকে পড়াবে।'

বানরের এমনি বুদ্ধি, যে বই পায় সে দুদিনে পড়ে শেষ করে ফেলে। সে দু বছরে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠল। বড় রানীদের ছেলেরা তখনও দু-তিনখানি বই পুঁথি শেষ করতে পারে নি; রোজ খালি মাস্টারের বকুনি খায়।

এসব কথা শুনে রাজা একদিন বললেন, 'বটে? বানরের এমনি বুদ্ধি? নিয়ে এসো তো তাকে, আমি দেখব।'

বানরের কিছুতেই ভয় নেই; রাজা ডেকেছেন শুনে সে অমনি তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তাকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে রাজার এমনি ভাল লাগল যে, তিনি আর কিছুতেই ছোট-রানীকে কুঁড়েঘরে ফেলে রাখতে পারলেন না। বাড়ীতে আনতেও ভরসা পেলেন না, পাছে বড় রানীরা কিছু বলেন। তাই তিনি ছোটরানীকে রাজবাড়ির পাশেই একটি খুব সুন্দর বাড়ি করে

দিলেন। সেই বাড়িতে তখন থেকে ছোটরানী তাঁর বানর নিয়ে থাকেন।

টাকাকড়ি যত লাগে রাজার লোক এসে দিয়ে যায় ; লোকে তাঁর বাড়িটাকে বলে বানরের বাড়ি। এসব দেখে বড় রানীদের ছেলেরা বানরকে আরও বেশী হিংসা করতে লাগল।

একটু একটু করে ছেলেরা সব বড় হয়ে উঠল। সকলে রাজাকে বলল, 'রাজপুত্রেরা বড় হয়েছেন, এখন এঁদের বিয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'তাদের দেশ বিদেশ ঘুরতে দাও। তারা নানান জায়গা দেখে, নানান রকম শিখে, টুকটুকে ছয়টি রাজকন্যা বিয়ে করে আসুক।'

সকলে বলল, 'বেশ বেশ! তাই হোক।'

তারপর ছয় রাজপুত্র সেজেগুজে, টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নানান দেশ দেখতে বেরুল। তা দেখে বানর তার মাকে গিয়ে বলল, 'মা, আমিও যাব।'

তার মা বললেন, 'তুমি কী করতে যাবে জাদু, তোমাকে কোন্ টুকটুকে রাজকন্যা বিয়ে করবে?

মা বললেন, 'তুমি যে দেশ দেখতে যাবে, আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকব?'

বানর বলল, 'আমি দেখতে দেখতে ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে যেতে দাও।'

কাজেই ছোটরানী আর কী করেন? বানরকে যেতে দিতেই হল।

ছয় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে ; রাজবাড়ি থেকে অনেক দূর চলে এসেছে। একটা বনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ, সেই পথে চলতে চলতে তাদের নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় বনের থেকে বানর বেরিয়ে এসে বলল, 'দাদা, আমিও এসেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

তাতে রাজপুত্ররা যারপরনাই রেগে বলল, 'বটে রে, তোর এতবড়

আস্পর্ধা! আমরা রাজকন্যা বিয়ে করে আনতে যাচ্ছি বলে তুইও তাই করতে যাবি! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!' এই বলে তারা বানরকে মারতে মারতে আধমরা করে একটা গাছে বেঁধে রেখে চলে গেল।

সেই বনে ছিল একদল ডাকাত। তারা দেখল যে ছয়জন রাজপুত্র ভারী সাজ করে টাকাকড়ি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। দেখেই তো তারা মার-মার করে চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। রাজপুত্রেরা ভয়েই জড়সড়ো, তলোয়ার খুলবার কথা আর তাদের মনেই নেই। তাদের টাকাকড়ি, ঘোড়া, পোশাক—সবসুদ্ধ তাদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে যেতে তাদের দু মিনিটও লাগল না।

রাজপুত্রদের ধরে নিয়ে খানিক দূরে এসেই ডাকাতেরা দেখল পথের ধারে একটা বানর বাঁধা রয়েছে। তাকেও তারা সঙ্গে করে নিয়ে চলল। বানর যেন তাতে বেশ খুশী হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে লাগল। তা দেখে ডাকাতেরা ভাবল, বুঝি কারু পোষা বানর, কাজেই তাকে আর তারা তেমন করে বাঁধল না।

সেই বনের ভিতরেই ডাকাতদের ঘর। সেদিন তাদের বড্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই রাজপুত্রদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে এসে বাঁধনসুদ্ধই ছটি ভাইকে একটা জায়গায় ফেলে রেখে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন খুব করে তাদের নাক ডাকতে লেগেছে, তখন বানর চুপিচুপি তার নিজের বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজপুত্রদের বাঁধন খুলে দিয়েছে। তখন আর তারা বানরকে ফেলে যাবে কোন্ লাজে? কাজেই তাকেও সঙ্গে করে, জিনিষপত্র নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে অমনি তারা প্রাণপণে ছুট দিল, ডাকাতেরা কিছু টের পেল না।

ডাকাতদের ওখান থেকে পালিয়ে রাজপুত্রেরা প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগল, ভোরের আগে আর তারা কোথাও থামল না। সকালে তারা দেখল যে তারা ভারী চমৎকার একটা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে খুব বড় এক রাজার দেশ; তাঁর বাড়ি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, যেন একটা ঝকঝকে সাদা পাহাড়।

ছয় রাজপুত্র সেই বাড়ির কাছে গিয়ে টকটক করে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। দারোয়ানেরা তাদের পোশাক আর ঘোড়ার সাজ দেখে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সেলাম করল, আর কিছু বলল না। বানর কিন্তু জানে যে সে সেখানে গেলেই তাকে ধরে ফেলবে; তাই সে রাজবাড়ির পিছনের দিকে গিয়ে, খিড়কির পুকুরের ধারে শুয়ে রইল।
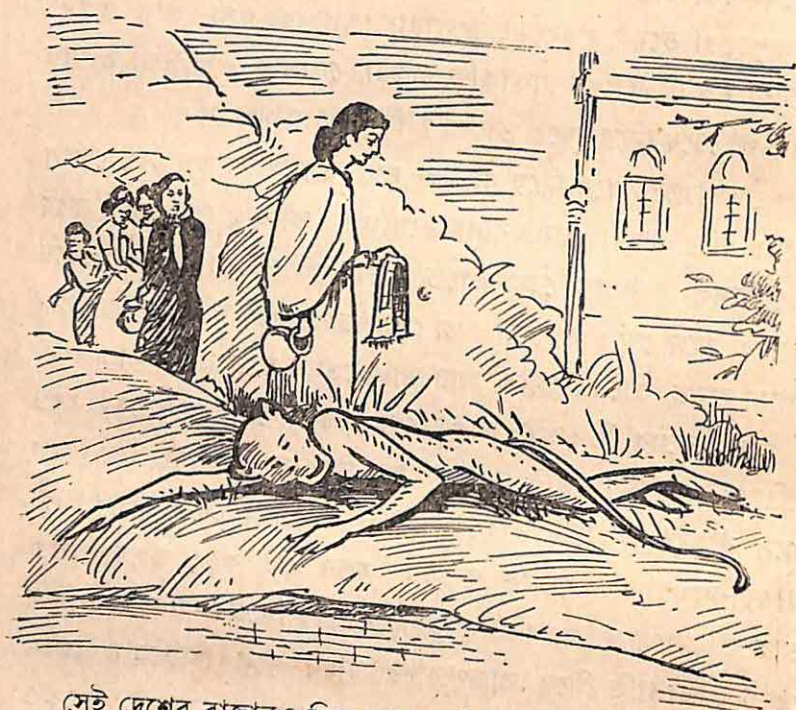
সেই দেশের রাজারও ছিল সাত রানী। তাদের বড় ছজন ছিল ভারী হিংসুক আর দেখতে বিশ্রী, আর ছোটটি ছিলেন পরীর মতো সুন্দর আর বড় লক্ষ্মী। বড়রা রাজাকে মিছামিছি নানান কথা বলে, ছোটরানীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; তিনি খিড়কির পুকুরের ধারে একটি কুঁড়ের ভিতরে থাকতেন, রাজা তাঁর কোন খবরও নিতেন না। বড় ছয় রানীর ছটি মেয়ে ছিল, তারা দেখতে ছিল ঠিক তাদের মায়ের মতন, আর তাদের মনও ছিল তেমনি। আর ছোটরানীর যে মেয়েটি ছিল, সেও ছিল ঠিক তার মার মতো—তেমনি সুন্দর,

তেমনি লক্ষ্মী। তা হলে কী হয়, বড় রানীরা রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ছোটরানীর মেয়েটা পাগল, কালো, কুঁজো, কানা, খোঁড়া, কালা আর বোবা।

সেই খিড়কির পুকুরের ধারে, সেই ছোটরানীর কুঁড়েঘরের কাছে বানর গিয়ে শুয়ে রয়েছে। খানিক বাদে বড় রানীদের ছয় মেয়ে ছটি ঘটি নিয়ে সেখানে স্নান করতে এল, ছোটরানীর মেয়েটিও তার ছোট্ট ঘটিটি নিয়ে এল। তারা স্নান করে চলে আসবার সময় সেই মেয়েটির ঘটি থেকে কেমন করে খানিকটা জল বানরের গায়ে পড়ে গেল। অমনি বড় রানীদের ছয় মেয়ে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওমা! ওমা! তোমরা দেখো এসে—ছোটরানীর মেয়ে বাঁদরটাকে বিয়ে করেছে!' বড় রানীরাও তা শুনে ছুটে এসে বলতে লাগল, 'তাই তো, তাই তো। ছোটরানীর মেয়ে বাঁনরটাকে বিয়ে করেছে!'

সেই খবর তখনি তারা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। দেশের সকল লোক রাজার সভায় বসে শুনল যে ছোটরানীর মেয়ের একটা বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

ছোটরানীর মনে যে কী কষ্ট হল, তা আর কী বলব? তিনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, মেয়েটিকে বুকে নিয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে বানর তাঁদের ঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে হাত জোড় করে বলল, 'মা, আপনি কাঁদবেন না। ভগবান যা করেন ভালই করেন; এ থেকেও আপনাদের ভাল হতে পারে।' বানরকে মানুষের মত কথা কইতে দেখে রানী উঠে বসলেন। তাঁর মনের দুঃখ যেন কোথায় চলে গেল। সেই থেকে বানর তার ঘরের কাছে গাছের ওপরে থাকে আর প্রাণপণে তাঁর সেবা করে। রানী যখন শুনলেন যে সে রাজপুত্র, তখন সে যে বানর, সে কথা তিনি ভুলে গেলেন; তাঁর মনে হল যে এমন ভাল আর বুদ্ধিমান লোক আর মানুষের ভিতরে নাই।

এদিকে হয়েছে কী, সেই ছয় রাজপুত্রও রাজার বাড়িতে ঢুকে একেবারে তাঁর সভায় এসে হাজির হয়েছে; রাজা দেখেই বুঝতে

পেরেছেন, এরা রাজপুত্র। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপু, তোমরা কে? কী করতে এসেছ?' তারপর যখন তাদের বাপের নাম শুনলেন, আর শুনলেন যে তারা বিয়ে করবার জন্য রাজকন্যা খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন তো আর তাঁর খুশির সীমাই রইল না। তিনি বললেন, 'বাঃ! তোমরা যে আমার বন্ধুর ছেলে! বেশ হল; আমার ছয় মেয়েকে তোমরা ছজনে বিয়ে করবে।'

ঠিক এমনি সময় বাড়ির ভিতর থেকে খবর এল যে, ছোটরানীর মেয়ের একটা বাঁদরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রাজপুত্ররাও তখনি বুঝে নিল যে এ আর কেউ নয়, তাদেরই বাঁদর। তাদের মনে হিংসাটা যে হল! বাঁদর এসে তাদের আগেই রাজার মেয়ে বিয়ে করে ফেলল,—লোকে আবার কানাকানি করে বলে যে সে মেয়ে নাকি রাজার আর ছয় মেয়ের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর আর ভালো— এসব কথা তারা যত ভাবে ততই খালি হিংসায় জ্বলে মরে।

যা হোক, রাজার ছয় মেয়ের সঙ্গে তো তাদের ছয় জনের বিয়ে হয়ে গেল তারপর ঝকঝকে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তারা বউ নিয়ে দেশে চলল। বানরও একটি ছোট নৌকায় করে তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের পিছু পিছু চলেছে। তাকে দেখেই ছয় রাজপুত্র রেগে ভূত হয়ে গেছে আর ভেবেছে যে একে বউ নিয়ে দেশে পোঁছতে দেওয়া হবে না। মুখে কিন্তু 'ভাই, ভাই' বলে ভারী আদর দেখাতে লাগল, যেন তাকে কতই ভালবাসে। শেষে যখন বাড়ির কাছে এসেছে, তখন রাত্রে ঘুমের ভিতরে বেচারার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিল। ভাগ্যিস ছোট বউ টের পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা বালিশ ফেলে দিয়েছিল, আর তাই ধরে অনেক কষ্ট সে কোন-মতে ডাঙ্গায় উঠল, নইলে সে যাত্রা আর উপায়ই ছিল না।

তারপর সকালবেলায় নৌকা এসে ঘাটে লাগল, রাজা খবর পেয়ে ছেলে-বউদের আদর করে ঘরে নিতে এলেন। ছয় ছেলে এসে তাঁকে প্রণাম করল, রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বানর কই?' তারা বলল, 'সে জলে ডুবে মারা গিয়েছে!'

বানর তো মরেনি, সে নদীর ধারে ধারে তাদের আগেই ঘাটে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ওরা 'সে জলে ডুবে মারা গেছে' বলতেই বানর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'আমি মরি নি বাবা, ওরা আমার হাত-পা বেঁধে আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি।'

তখন তো রাজপুত্রদের মুখ চুন। রাজা ভয়ানক রেগে তাদের বললেন, 'বটে! তোদের এই কাজ? দূর হ তোরা আমার দেশ থেকে; আর তোদের মুখ দেখব না!'

এই বলে দুষ্ট ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা যারপরনাই আদরের সহিত বানর আর ছোট বউকে ঘরে নিয়ে এলেন। বানরের মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আর এমন সুন্দর লক্ষ্মী বউ ঘরে এনে যে কত সুখী হলেন তা বুঝতেই পার।

তারপর খুব সুখেই তাঁদের দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে হয়েছে কী, বউমা দেখলেন যে বানর শুধু দিনের বেলায়ই বানর সেজে বেড়ায়; রাত্রে সে বাননের ছাল খুলে ফেলে দেবতার মত সুন্দর মানুষ হয়। এ কথা তিনি ছোটরানীকে বললেন, ছোটরানী আবার রাজাকে জানালেন। রাজা তো শুনে ভারি আশ্চর্য হয়ে এসে বললেন; 'বউমা, তুমি এক কাজ করো। আজ রাত্রে যখন সে বানরের ছাল খুলে ঘুমোবে, তখন তুমি সেই ছালটাকে পুড়িয়ে ফেলবে।'

সেদিন বানরের শোবার ঘরের পাশের ঘরে মস্ত আগুন জেলে রাখা হল, বানর তা জানতে পেল না। তারপর রাত্রে যেই ছাল খুলে রেখে সে ঘুমিয়েছে অমনি রাজকন্যা চুপিচুপি নিয়ে সেটাকে সেই আগুনে ফেলে দিয়েছেন। সকালে বানর উঠে দেখে তার ছাল নেই। তখন সে তো ধরা পড়ে গিয়ে খুবই ব্যস্ত হল কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কী হবে, আর বানর হবার জো নেই। দেখতে দেখতে সেই খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, আর ছেলেবুড়ো সকলে ছুটে এসে, সব দেখেশুনে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

দুঃখীরাম

দুঃখীরাম খুব গরীবের ছেলে ছিল। সকলে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত, কিন্তু তাহার এর চাইতে ঢের ভাল একটা নাম ছিল —সেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

দুঃখীরামের যখন সবে দুই বছর বয়স, তখন তাহার মা-বাপ মরিয়া গেল, পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, খালি ছিল মামা কেষ্ট। দু বছরের ছেলে দুঃখীরাম তাহার মামার খবর কিছুই জানিত না, তাহার মামাও তাহার কোন খবরই লইল না। কাজেই পাড়ার লোকেরা দয়া করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তখন হইতেই লোকে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত।

গরিবের ছেলের দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই অনেক সময় মুশকিল হয়, এর উপর আবার কে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে? অন্য ছেলেদের ফেলিয়া-দেওয়া ছেঁড়া বই পড়িয়া আর পাড়ার লোকের খুঁটিনাটি কাজ করিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দুঃখীরাম শুনিল যে কেষ্ট বলিয়া তাহার একজন মামা আছে। শুনিয়াই সে মনে করিল যে একবার মামার বাড়ি যাইতে হইবে।

অনেক সন্ধান করিয়া শেষে সে কেষ্টর বাড়ি বাহির করিল। কেষ্ট তাহাকে দেখিয়াই বলিল, 'তাই তো, দুঃখীরাম এসেছ! এখানে কত কষ্ট পাবে তা তো জান না। আমরা যে দু মাসে এক দিন খাই! কাল খেয়েছি, আবার দু মাস পরে খাব।'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তার জন্য ভাবনা কী? তোমরা যখন খাবে, আমিও তখনই খাব।' কেষ্ট আর কিছুই বলিল না; দুঃখীরামও আর কিছু বলিল না। মামার বাড়িতে খালি মামা আর মামাতো ভাই হরি ছাড়া আর কেহ নাই। মামাতো ভাইকে সে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

সারাদিন কেষ্ট আর হরি কেহই কিছু খাইল না। কাজেই দুঃখীরামেরও খাওয়া জুটিল না দুঃখীরাম এর চাইতে অনেক বেশী সময় না খাইয়া কাটাইয়াছে, সুতরাং তাহার বড় একটা ক্লেশও হইল না। সন্ধ্যার সময় সে কেষ্টকে বলিল, 'মামা আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোই।' ইহাতে কেষ্ট যেন ভারী খুশী হইল, আর তখনই তাহাকে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। দুঃখীরাম সেই মাদুরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিক পরে কেষ্ট আর হরি আসিয়া তাহার পাশেই ঘুমাইতে লাগিল। আসল কথা, কেহই ঘুমোয় নাই,—মামা খালি ভাবিতেছে,, কতক্ষণে দুঃখীরাম ঘুমাইবে, আর দুঃখীরাম ভাবিতেছে, এর পর মামা কী করে।

দেখিতে দেখিতে হরির নাক ডাকিল। দুঃখীরাম বুঝিল, দাদা ঘুমাইয়াছে। এর একটু পরে দুঃখীরাম পাশে একটা খচমচ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারল যে' এবারে মামা উঠিয়াছে। তার পর হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ার শব্দ হইল। তার পর হাঁড়ি ধোয়ার খলখল শব্দ, উনান ধরাইবার ফুঁ—সকলই শুনা গেল। দুঃখীরামের আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে চুপিচুপি উঠিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফুটা দিয়া দেখিল, কেষ্ট পায়াস রাঁধিতেছে।

দুঃখীরাম এক-একবার উঠিয়া দেখে, আবার আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। যখন দেখিল যে পায়স প্রস্তুত হইয়াছে, তখন হাউ-মাউ করিয়া উঠিয়া বসিল। গোলমাল শুনিয়া কেষ্ট তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে দুঃখীরাম, কী হইয়াছে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, ও ঘরে তুমি কী করছিলে, আর একজন লোক খালি বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিল।' দুঃখীরাম নিজের কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেষ্ট মনে করিল বুঝি চোর আসিয়াছে। তাই সে লাঠি হাত ঘরের পেছনে বনের ভিতরে চোর তাড়াইতে ছুটিল।

তখন দুঃখীরাম তাহার দাদাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, 'দাদা

ওঠো, মামা একটা লাঠি হাতে তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

হরি বেচারার মনে ভারি ভয় হইল। সে মনে করিল যে লাঠি হাতে যখন গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটু দূরে কোথায়ও গিয়াছে। তিন মাইল দূরে হরির ভগ্নীর বাড়ি, হয়তো হঠাৎ তাহার কোন ব্যায়াম হইয়াছে, আর বাবা খবর পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া হরি ব্যস্ত হইয়া তাহার ভগ্নীর বাড়ি চলিল। খানিক পরে কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। সে চোরকে তো ধরতে পারেই নাই, লাভের মধ্যে বিছুটি লাগিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া হরিকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হরি কোথায় রে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তুমিও গেলে আর যে লোকটা তোমার ঘরে উঁকি মারছিল, সেই লোকটা দাদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল; আর দাদাও তখ্খুনি বেরিয়ে গেল।'

ইহা শুনিয়া কেষ্ট মনে করিল যে হরি নিশ্চয় পাড়ায় দুষ্ট ছেলের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলিতে গিয়াছে। সুতরাং হরি এবং সেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেটার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল, আর সেই লাঠি হাতে করিয়াই সে তাহার সঙ্গীকে শাস্তি দিবার জন্য পাড়া খুঁজিতে বাহির হইল।

দুঃখীরাম যখন দেখিল, যে মামা আর দাদার বাড়ি ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে, তখন সে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া পায়সের হাঁড়ি নামাইল। একে দুঃখীরামের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, তার উপর আবার তার মামা রাঁধে বড় সরেস। সুতরাং দোখতে দেখিতে সেই পায়েসের হাঁড়ি খালি হইয়া গেল। তারপর দুঃখীরাম আবার সেই মাদুরে শুইয়া আরামে নিদ্রা গেল।

হরি ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়া তাহাকে ভালই দেখিতে পাইল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার বোন আর তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে দিল না। এদিকে কেষ্ট তাঁহাকে আকাশ-পাতাল করিয়া খুঁজিয়াছে, এবং

তাহাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া রাগে আর বিছুটির জ্বালায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং ভোরবেলা হরি যেই বাড়ি ফিরিয়া আসিল, অমনি কেষ্ট সেই লাঠি দিয়া তাহাকে খুব কয়েক ঘা লাগাইল।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি নাকাল হইয়া শেষে রান্নাঘরে গিয়া সে দেখে—পায়েসের হাঁড়ি খালি! তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখীরাম সকালে উঠিয়া অবধি কেমন আড়চোখে চায়, আর একটু হাসে। সুতরাং তাহা যে দুঃখীরামের কাজ, ইহা বেশ বুঝা গেল।

পরদিন বাপবেটায় মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিতে গেল। রাজা দুঃখীরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে তুই এমন কাজ কেন করলি? ওদের পায়েস চুরি করে কেন খেলি?—আর মিছে কথা বলে কেন ওদের নাকাল করলি।'

দুঃখীরাম হাত জোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই ধর্মাবতার! ওঁরা দু মাসে একদিন খান। পরশু খেয়েছিলেন, আবার কাল পায়েস রাঁধলেন কেন? ওঁরাই বলুন। তারপর নাকাল করার কথা বলছেন? তা আমি তো সত্যি কথাই বলেছি, তাতে যদি ওঁরা খামাকা নাকাল হতে গেলেন, তা আমার কী দোষ।'

রাজা আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

দুঃখীরামকে বেশ চালাক চতুর দেখিয়া রাজা তাহাকে একটি চাকুরি দিলেন। দুঃখীরাম এত ভাল কাজ করিতে লাগিল, যে কয়েক বৎসরের ভিতরেই সেই সামান্য চাকরী হইতে ক্রমে সে ছোট মন্ত্রীর পদে উঠিল। বড় মন্ত্রীর পদ খালি হইলে যে তাহাও সে পাইবে, এ কথা সকলেই বলিতে লাগিলেন।

বড় মন্ত্রী লোকটা বড় সুবিধার ছিলেন না। দুঃখীরামকে তিনি ভারি হিংসা করিতেন, আর কী করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন ক্রমাগত তাহাই ভাবিতেন।

এক সওদাগরের সঙ্গে বড় মন্ত্রীর বন্ধুতা ছিল। সেই সওদাগরের একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া ছিল। পক্ষীরাজ ঘোড়া মানুষের মত কথা কহিতে পারে, আর ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারে। এই ঘোড়াটাকে পাইবার জন্য মন্ত্রীমহাশয় অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সওদাগর কিছুতেই সেটা তাঁহাকে দিতে চায় না।

এর মধ্যে সওদাগর একবার বিদেশে গিয়াছিল, সেখান হইতে একটা খুব আশ্চর্য আমের আঁটি লইয়া আসিয়াছে। সে আঁটির এই গুণ যে, তাহা পুঁতিবামাত্র গাছ হয়, তাতে তৎক্ষণাৎ আম হয়, তখনই সেটা পাকে, আর তখনই তাহা খাওয়া যায়। খাওয়ার পর আবার সেই আঁটি মাটির ভিতর হইতে তুলিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়।

মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের চাকরকে টাকা দিয়া বশ করিলেন। সে তাঁহার কথায় সওদাগরের আমের আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিল। তারপর একদিন মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বন্ধু তুমি নাকি ভারি আশ্চর্য একটা আমের আঁটি আনিয়াছ?' সওদাগর বলিল, 'হ্যাঁ বন্ধু, সেটাকে পুঁতিলে তখনই গাছ হয়, তখনই তাতে ফল হয়, তখনই তাহা পাকে, আর তখনই তাহা খাইয়া আঁটিটি আবার বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়।'

মন্ত্রীমহাশয় নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

সওদাগর বলিল, 'আচ্ছা বাজি রাখুন। আমার কথা সত্য হয় তো কী হইবে?' মন্ত্রী বলিলেন, 'তাহা হইলে পরদিন আমার বাড়িতে গিয়া প্রথমে যে জিনিসটাতে হাত দিবে সেইটা তোমার, আর যদি তোমার কথা সত্য না হয়?' সওদাগর বলিল, 'তবে আপনি পরদিন আমার বাড়িতে আসিয়া প্রথমে যাহাতে হাত দিবেন তাহাই আপনার হইবে।'

ঠিক হইল, পরদিন সওদাগরের বাড়িতে মন্ত্রীমহাশয়ের নিমন্ত্রণ, আর তখন আমের আঁটির পরীক্ষা হইবে। আঁটি সিদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ফল কী হইল তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সওদাগর বেচারার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এবারে সে বুঝিতে পারিল যে আর পক্ষীরাজ ঘোড়াকে রাখিতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর কাছে গেল। সেখানে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধিমান ছোট মন্ত্রী একটু চিন্তা করিয়া তাহাকে একট উপায় বলিয়া দিলেন। সওদাগর সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ার আস্তাবলে দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের বাড়ি গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বন্ধু! বন্ধু!' সওদাগর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মন্ত্রীমহাশয়ের একটু বসিবার দেরী সয় না। তিনি না বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই বন্ধু, সে কথার কী হইল?' সওদাগর বলিল, 'আমি প্রস্তুত আছি, এখন আপনার যাহাতে খুশি হাত দিয়া লইয়া যাইতে পারেন।' মন্ত্রীমহাশয় অমনি আস্তাবলের দিকে চলিলেন; সওদাগরও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

আস্তাবলের দরজা বাঁধা ছিল। মন্ত্রীমহাশয় দড়ি ধরিয়া এক টান দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি সওদাগর বলিল, 'সে কী বন্ধু! আপনার মতন লোকের ঐ সামান্য দড়িগাছাটায় লোভ! একটা কোন দামী জিনিস লইলে সুখী হইতাম।' মন্ত্রীর তো চক্ষু স্থির! অত সহজে ঠকিবেন, তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। সওদাগরের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিয়া তিনি ঘরে ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মন্ত্রীমহাশয় স্থির করিলেন যে ছোট মন্ত্রী ছাড়া আর কাহারও কর্ম নয়, তারপর যখন শুনলেন যে, সেদিন রাত্রে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর বাড়ি গিয়াছিল তখন বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহা ছোট মন্ত্রীর কাজ।

পরদিন দুপুরবেলা যখন রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তখন মন্ত্রীমহাশয় গিয়া জোড় হাতে তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে রাজা চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কী বড় মন্ত্রী?' মন্ত্রী বলিলেন, 'দোহাই মহারাজ! সুলক্ষণ সওদাগরের একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে কিন্তু মহারাজের আস্তাবলে একটাও পক্ষীরাজ ঘোড়া নাই।' রাজা বলিলেন, 'বটে! ও ঘোড়া আমার চাই।' মন্ত্রী আরও বিনয় করিয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিলেন, 'মহারাজের যাহাতে ভাল হয় আমার সেই চেষ্টা, আর ছোটমন্ত্রী দিন রাত তাহাতে বাধা দেন!' রাজা বলিলেন, 'সে কী রকম?' মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজের জন্য সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া আমি আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ছোট মন্ত্রী সুলক্ষণকে মন্ত্রণা দিয়া সে ঘোড়া আনিতে দেয় নাই।'

রাজাদের মেজাজ সেকালে বড়ই অস্থির ছিল। সহজেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর সামান্য কথাতেই চটিয়া উঠিতেন। বকশিষ দিতেন তো অর্ধেক রাজ্যই দিয়া ফেলিতেন, আর সাজা দিতেন তো মাথাটাই কাটিয়া ফেলিতেন। রাজা ছোট মন্ত্রীর উপর এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তাহাকে ছোট মন্ত্রী করিয়াছিলেন। আজ বড় মন্ত্রীর কথা শুনিয়া এতই চটিয়া গেলেন যে, তখনই তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বেচারা কোন বিপদের কথা জানিত না, সুখে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় রাজার লোক আসিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

দুঃখীরামের এই সাজার হুকুম হইল যে, তাহাকে থলের ভিতর পুরিয়া পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। রাজামহাশয়ের সামনেই থলে আর পাথর আনিয়া সব বাঁধিয়া ঠিক করা হইল, তারপর রাজা চারিটা জল্লাদকে হুকুম দিলেন যে 'একে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।'

দুঃখীরামকে সকলেই ভালবাসিত। সুতরাং তাহার এই সাজার কথা শুনিয়া সকলেরই ভারি ক্লেশ হইল। পথে যাইতে যাইতে জল্লাদেরা চুপি চুপি পরামর্শ করিল যে, এমন ভাল লোককে কখনই

সমুদ্রে ফেলিয়া মারা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সমুদ্রের ধারে একটা বনের ভিতরে দুঃখীরামকে রাখিয়া থলের মুখ খুলিয়া দিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহাকে একখানি কুড়াল আর এক টুকরা নেকড়া দিয়া বলিয়া আসিল, 'ছোট মন্ত্রীমশাই, আমরা আর তোমাকে কী দিতে পারি, এই নেকড়া ও কুড়াল নাও, কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে খেও। তোমার দোহাই ছোট মন্ত্রীমশাই, আমাদের রাজার দেশে যেও না। সেখানে তোমাকে দেখতে পেলে রাজা তোমাকেও রাখবে না, আমাদেরও রাখবে না।'

দুঃখীরাম এখন কাঠুরে হইয়াছে, লম্বা লম্বা চুল দাড়ি গোঁফ রাখিয়াছে আর নিজের পোশাকটা ফেলিয়া দিয়া সেই জল্লাদের দেওয়া নেকড়াখানা পরে। ভাল করিয়া স্নান না করাতে তাহার গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে ঢের রোগা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে দেখিলে আর চট করিয়া চেনা যায় না। এইরূপ অবস্থায় কষ্টে দুঃখীরামের দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে বাহির হইয়া দুঃখীরাম দেখিল যে, ঝরনার ধারে গাছতলায় এক বুড়ী ঘুমাইতেছে। সে এতই বুড়া হইয়াছে যে, তেমন বুড়ামানুষ আর দুঃখীরাম কখনও দেখে নাই। বুড়ীকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল, যে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ চুপিচুপি সেই বুড়ীর দিকে যাইতেছে। দুঃখীরাম তখনই কুড়াল দিয়া সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল আর সেই টুকরাগুলি ঝরনার জলে ফেলিয়া দিল। কী আশ্চর্য! সেই টুকরাগুলি জলে পড়িবামাত্র জলটা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া বুড়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বুড়ী খানিক অবাক হইয়া ঝরনার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাবা?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি দুঃখীরাম।' বুড়ী বলিল, 'বাবা, তুমি কী চাও?'

দুঃখীরাম বলিল, 'আমি কিছু চাই না। তুমি বুড়োমানুষ, বনের ভিতর কেন আসিয়াছ? কত জন্তু-টন্তু আছে, শীঘ্র চলিয়া যাও।' বুড়ী বলিল, 'বাপু, তুমি আমাকে প্রাণ বাঁচাইয়াছ, আমি তোমাকে কিছু না দিয়া অমনি যাইতে পারিতেছি না।' দুঃখীরাম কিন্তু কিছুই
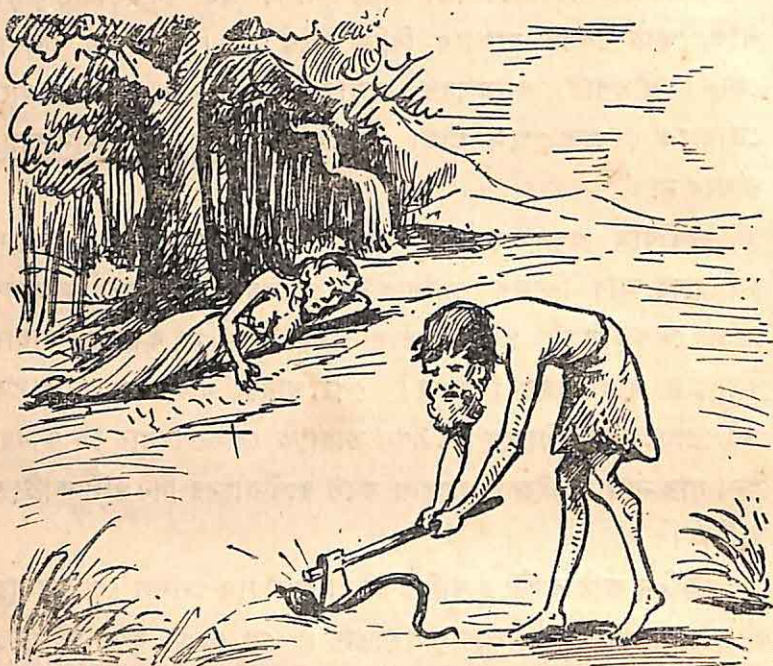
লইবে না, সুতরাং বুড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় চুপিচুপি বলিয়া গেল, 'তুমি কিছু লইলে না—আচ্ছা, আমি তোমাকে এক বর দিয়া যাইতেছি যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।' দুঃখীরাম ততক্ষণে কুড়াল হাতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ সকল কথা সে শুনিতে পাইল না।

আজ দুঃখীরামের ঢের বেলা হইয়া গিয়াছে। কখন কাঠ কাটা হইবে, সেই কাঠ বাজারে বিক্রী হইবে, তবে তাঁহার পেটে দুটি ভাত পড়িবে। এ সকল কথা ভাবিয়া বেচারীর মনটা একটু দুঃখিত ছিল, তাই তত সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারিতেছে না। সামনে একটা

ছোট গাছ পড়িয়া ছিল তাহাতে হোঁচট খাইয়া দুঃখীরাম পড়িয়া গেল। একে মন ভাল নাই, তাহার উপর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে কাহার না রাগ হয়? দুঃখীরাম রাগিয়া বলিল, 'দূর হ ছাই। এ মুল্লুকে গাছপালা না থাকিলেই ভাল ছিল!'

যেই এ কথা বলা, আর অমনি সেখানকার যত গাছপালা সব কোথায় চলিয়া গেল, যেখানে ভয়ানক বন ছিল, সেখানে খালি মাঠ ধূ ধূ করিতে লাগিল। কী সর্বনাশ! এখন কাঠই বা কোথা হইতে মিলে, আর দুঃখীরামের খাওয়াই বা কী করিয়া হয়? বেচারা ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই অবাক! ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আপন মনে খালি হাঁটিয়া চলিল। বেলা ঢের হইয়াছে, ক্ষুধা আরও বেশী হইয়াছে, এমন অবস্থায় শুধু পথ চলিতেই কত কষ্ট, তাহাতে আবার হাতে প্রকাণ্ড কুড়াল; সে যে-সে কুড়াল নয়, জল্লাদের কুড়াল। সাধারণ কুড়ালের দুখানার সমান তাহার একখানা ভারী হয়। সেদিন দুঃখীরামের কাছে সেটা যেন দশটা কুড়ালের মত ভারী ঠেকিতে লাগিল, আর সেটাকে বহিয়া নিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং দুঃখীরাম সেটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি আর পারি না, অত ভারী কুড়ালের হাত-পা থাকা উচিত, তাহা হইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে।'

কুড়াল তাহাই করিল। কোথা হইতে মাকড়সার পায়ের মতন তাহার সব পা হইল; আর সে টুকটাক করিয়া দুঃখীরামের পিছু পিছু চলিল। দেখিয়া শুনিয়া বেচারার মাথায় আরও গোল লাগিয়া গেল। তিনি একভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, হইল কী!

যাইতে যাইতে দুঃখীরাম একেবারে নিজের দেশের বাজারে গিয়া উপস্থিত। প্রভুভক্ত কুড়াল সঙ্গেই আছে; সে এমনিভাবে চলিয়াছে, যেন চিরকাল তাহার ঐ রকম করিয়াই চলা অভ্যাস।

একটা কুড়াল যদি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তোমার সামনে দিয়া চলিয়া যায়, তুমি তাহা হইলে কী কর? আর তেমন একটা কুড়াল

যদি বাজারে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাজারের লোকগুলিই বা কী করবে? বাজারে প্রথম মোড়েই এক গোয়ালার দোকান। সেখানে এক বড়লোকের দারোয়ান ঘি কিনিতে আসিয়াছে। গোয়ালার হাতে ঘিয়ের বাটি দিয়া সবে সে পৈঠায় বসিয়া তামাকু খাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, দুঃখীরামের সেই কুড়াল হাত-পাসুদ্ধ একেবারে তাহার সামনে উপস্থিত! 'হায় বাপ' বলিয়া চারি হাত পা ঊর্ধ্বে উঠাইয়া দারোয়ানজী অমনি এক লাফে একেবারে গোয়ালার ঘাড়ে গিয়া উঠিল। গোয়ালাও তাড়াতাড়ি দারোয়ানজীকে ঠেলিয়া মাখনের হাঁড়িতে ফেলিয়া ঘরে দরজা আঁটিল। তারপর যখন দেখিল যে, সেটা কাহাকেও কিছু বলে না, তখন দরজা খুলিয়া দুজনেই তাহার পিছু পিছু তামাশা দেখিতে চলিল।

সেদিন বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। বাবুদের চাকর যাহারা বাজার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কুড়ালের পিছু-পিছু চলিয়াছে, তাহাদের বাজার করা আর হয় নাই। দোকানীরাও তাহাই করিতেছে—পুলিস-পাহারা সকলেই সেই কুড়ালের পিছু চলিয়াছে। চাকরদের সন্ধান লইতে বাবুরা আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সেই কুড়ালের তামাশা দেখিতেই রহিয়া গেলেন। এইরূপ করিয়া দেশের প্রায় সকল লোকগুলি সেইখানে আসিয়া জড়ো হইল। দুঃখীরামের সেই মামা আর মামাতো ভাই কেষ্ট আর হরিও তাহাদের ভিতর ছিল।

কেষ্ট আর হরি প্রথমে কুড়ালের তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তারপর একবার যেই দুঃখীরামের মুখের উপর চোখ পড়িল, অমনি তাহাদের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ দুঃখীরাম। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর নিকট গিয়া খবর দিল যে, 'মন্ত্রীমহাশয়, সেই দুখেটা আসিয়াছে।' মন্ত্রী অবিলম্বে এই সংবাদ রাজাকে দিলেন আর বলিলেন, 'মহারাজ, কুড়াল কি কখনও হাঁটে?

এ নিশ্চয় কোন জাদু-টাদু শিখিয়া বদ মতলবে এখানে আসিয়াছে।'
রাজা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ মন্ত্রী, এখনি দশজন সিপাহী পাঠাইয়া দাও, উহাকে বাঁধিয়া নিয়া আসুক।' রাজার হুকুমে দানবের মত দশটা পালোয়ান দুঃখীরামকে আনিতে চলিল।

এদিকে বাজারের লোকেরা দুঃখীরামকে তত গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু তাহার কুড়ালটাকে রাজার কাছে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে কুড়ালের গায়ে কী ভয়ানক জোর! তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারের সমস্ত লোক মিলিয়া কত টানিল, কিছুতেই তাহাকে এক পাও নাড়িতে পারিল না; বরং তাহারা যে দশ মিনিট ধরিয়া প্রাণপণে 'হিঁয়ো' করিয়াছে, ততক্ষণে দুঃখীরামের কুড়ালই তাহাদিগকে আধ মাইল খানেক টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এমন সময় রাজার পালোয়ানেরা আসিয়া দুঃখীরামকে বাঁধিতে লাগিল। দুঃখীরামের কাছে আজ আর কিছুই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় না। সে কেবল দেখিতেছে, এর পর কী হয়। স্বয়ং বড় মন্ত্রী পালোয়ানদের সঙ্গে আসিয়াছেন, আর বলিতেছেন, 'শক্ত করিয়া বাঁধ।' এ কথা শুনিয়া দুঃখীরাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'অন্যের বেলা বলা খুব সহজ; তোমাকে একবার ও রকম করিয়া বাঁধিত, তবে দেখিতে কেমন লাগে।'

অমনি চারটা পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে চিত করিয়া ফেলিয়া, ঠিক দুঃখীরামের মতন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। মন্ত্রীমহাশয় প্রথমে আশ্চর্য বোধ করিলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন; কিন্তু পালোয়ানেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। রাগে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা বাহির হইতেছে না, চোখ দুটো ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, গলার শির ফুলিয়াছে, মুখে ফেনা উঠিতেছে। কিন্তু পালোয়ানেরা তথাপি তাঁহাকে বাঁধিতে কসুর করিতেছে না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া তারপর পরীক্ষা করিয়া দেখিল ঠিক দুঃখীরামের মতন বাঁধা হইয়াছে কিনা। যখন দেখিল যে দুজনকেই ঠিক এক রকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট

লইয়া চলিল। বাজারের লোকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই সকল লোক যখন রাজার কাছে উপস্থিত হইল, তখন রাজামহাশয়ের ভারি রাগ হইল এমনও নহে। মন্ত্রীর বাঁধন তিনি নিজ হাতে খুলিয়া দিলেন, তারপর তাঁহাকে লইয়া দুঃখীরামের বিচার করিতে বসিলেন। যে সকল পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, প্রথমে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। দুঃখীরামের সম্বন্ধে একটা হুকুম দিবার পূর্বেই আহারের সময় হওয়াতে মাঝখানে রাজামহাশয় উঠিয়া গেলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর দুঃখীরামের হুকুম হইবে।

দুঃখীরাম বেচারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার চারধারে বিস্তর প্রহরী আছে, দর্শকদিগেরও অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছে। দুঃখীরামের দুঃখের কথা আর কী বলিব! অন্য কষ্টের বিষয় আর এখন ততটা ভাবেন না; কিন্তু ক্ষুধা তো কিছুতেই থামিয়া থাকিবার নহে। রাজামহাশয়, মন্ত্রীমহাশয়, সকলেই আহার করিতে গিয়াছেন। কত সুখাদ্য জিনিষ খাইয়া তাঁহারা পেট ভরিয়া আসিবেন। দুঃখীরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'আহা, ওসব জিনিস যদি আমাকে কেহ এখন আনিয়া দিত!'

রাজামহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সোনার পাত্রে শত ব্যঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সামনে রাখিয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাকে গেলে লম্বা লম্বা নিশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়, জিভে জল আসে। হাত ধুইয়া সবে রাজামহাশয় খাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি থালাসুদ্ধ খাবার জিনিস কোথায় যেন মিলাইয়া গেল! মন্ত্রীমহাশয়েরও ঐরূপ দশা হইল।

এদিকে দুঃখীরামের আক্ষেপ শেষ হইতে না হইতেই তাহার সামনে রাজা ও মন্ত্রীর আহারের সমস্ত আয়োজন আসিয়া হাজির হইল। দুঃখীরাম তাহাতে কিছুই আশ্চর্য বোধ করিল না; তাহার খালি দুঃখ হইতে লাগিল, 'হায় রে, হাত পা বাঁধা!' বলিতে বলিতে

তখনি তাহার বাঁধন খুলিয়া গেল, সে এক লাফে উঠিয়া বসিয়া দু'হাতে লুচি, মাছ, মাংস, পোলাও, পায়েস, মেঠাই, মোণ্ডা মুখে পুরিতে লাগিল।

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের চৈতন্য হইল। একজন বলিল, 'আরে ধর পালাবে।' আর একজন বলিল, 'কোথায় আর পালাবে, আমরা এতজন চারধারে দাঁড়িয়ে আছি। আহা বেচারার সামনে এত জিনিস এসেছে, একটু খেয়ে নিতে দে।' ও কথা শুনিয়া সকলেই বলিল, 'আহা, খাক্ খাক্!' দুঃখীরাম ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাপুসকল তোমরা রাজা হও।'

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল ; দেখিতে দেখিতে সেখানে তেমনি আরও হাজারটা সিংহাসন হইল। তারপর সকলেরই রাজার মত বেশভূষা হইল, আর তাহারা এক-একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।

রাজামহাশয় সভায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার মতন ঢের রাজা সভায় বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'মহারাজ, উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।' রাজা আর কী করেন, এতগুলি রাজার অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলা তো সহজ কথা নয়। কাজেই দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি খালাস পাইল।

এমন সময় মন্ত্রীমহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি রাজাকে একঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিকে চান সেই দিকেই রাজা, আর মন্ত্রীমহাশয় খালি দু হাতে সেলাম করেন! সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে করিতে কখন হজম হইয়া গেল।

দুঃখীরামের কথা শুনিয়া মন্ত্রীমহাশয় যারপরনাই ব্যস্ত হইলেন। জোড়হাতে তিনি রাজাদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলেন,—'দোহাই ধর্মাবতারগণ পুনরায় ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এমন দুষ্ট লোককে সহজে ছাড়িয়া দিবেন না, কখন কার সর্বনাশ করে তার

ঠিক নাই।' এই কথা শুনিয়া রাজাদের ভিতর হইতে একজন বলিল, 'সর্বনাশটা যে কী করলে তা তো বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মেথর ছিলাম, আর আজ আমাকে রাজা করে দিয়েছে। এই এখনি তুমি দুহাতে আমাকে কত সেলাম করলে !'

মন্ত্রীমহাশয় আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, সত্যি সত্যি তাঁহার মেথর রাজা সাজিয়া বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে সেলাম করিয়াছেন। ক্রমে দেখা গেল যে যত রাজা বসিয়া আছে সকলেই কেহ সহিস, কেহ পাইক, কেহ দারোয়ান, কেহ দোকানী, কেহ ভিখারী।

রাজা মহাশয় আর মন্ত্রীমহাশয় লজ্জা রাখিবার আর স্থান পান না। রাজা তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন, 'আবার বিচার হইবে, উহাকে ধর।' কিন্তু কে ধরিবে ? সবাই রাজা সাজিয়া বসিয়াছে, হুকুম খাটিতে কাহারও ইচ্ছা নাই। অগত্যা মন্ত্রীমহাশয়ই ধরিতে গেলেন। দুঃখীরাম তাহা দেখিয়া বলিল, 'মন্ত্রীমহাশয়, অত কষ্ট করেন কেন ? এই যে আমি হাজির আছি। কিন্তু আমার প্রাণদণ্ড হইলে আমাকে মারিবে কে ? জল্লাদ যে রাজা হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আর রাজা মহাশয় জল্লাদ হইলে তবে হয়।'

বলিতে বলিতে রাজা ও মন্ত্রীর সেই সুন্দর চেহারা আর জমকালো পোশাক কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে নেংটি-পরা, কুড়াল হাতে, কালোভূত দুই জল্লাদ সাজিয়া, জোড় হাতে হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এখন হুকুম দেয় কে ?

দুঃখীরাম এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, সে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ঘটনায় তাহাই হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে কী না করিতে পারিত। কিন্তু সে বলিল, 'মহারাজ আপনার নুন খেয়েছি, আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ হইব না। আপনার রাজত্ব আপনারই রহিল। এখন আপনি আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।'

লজ্জায় রাজামহাশয় মাথা হেঁট করিয়া আছেন। দুঃখীরামের কথায় তিনি আর কী উত্তর দিবেন ! কেবল বলিলেন, 'আমার

সমস্ত রাজ্যই তুমি লইতে পারিতে, ইচ্ছা করিলে আমায় প্রাণেও মারিতে পারিতে। এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে বুঝিলাম, তুমি মহৎ লোক। আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার হউক, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া সুখে রাজত্ব করো।'

দুঃখীরাম রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

আর সকলের কী হইল? মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে দুঃখীরাম কিছু বলে নাই, সুতরাং তিনি জল্লাদই রহিয়া গেলেন। যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এক নতুন মুশকিল উপস্থিত হইল।

রাজা হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্য কোথায় পাইবে? অথচ সকলেই বলে, 'আমি রাজা হয়েছি যে, কাজ কেন করব? ইহাতে ভারি অসুবিধা হইতে লাগিল। দুঃখীরাম বলিল, 'বাপুসকল, তোমাদের রাজা-টাজা হইয়া কাজ নাই, তোমরা যার যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম কর গিয়া, আর সৎপথে থাকিয়া সুখে তোমাদের দিন কাটুক।'

কুঁজো আর ভূত

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে ছিল ভয়ংকর একটা কুঁজ। বেচারা বড্ড ভাল মানুষ ছিল, লোকের অসুখ-বিসুখে ওষধ-পত্র দিয়ে তাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে তাকে কেউ ভালবাসত না!

কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান ছিল ; আর কোনো ঝুড়িওয়ালা তার মত ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারি হিংসা করত, আর তার নামে যা-তা বলে বেড়াত। তা শুনে লোকে ভাবত কানাই বড় দুষ্ট লোক ; তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে থাকত। বেচারার দুঃখের সীমাই ছিল না!

এতবড় কুঁজ নিয়ে মাথা 'গুঁজে চলতে কানাইয়ের বড়ই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরনো বাড়ির কাছে এসে এমনি অন্ধকার হল, আর তার এতই কাহিল বোধ হল যে, আর চলা অসম্ভব। সে জায়গাটা ভারি বিশ্রী ; লোকে প্রাণান্তেও সে-পথে আসতে চায় না, বলে, ওটা ভূতের বাড়ি। কিন্তু কানাইয়ের বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নেই! কাজেই সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কী করে?

কতক্ষণ সে এভাবে বলেছিল তার কিন্তু ঠিক নেই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল যেন সেই পুরনো বাড়িটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। অনেকগুলো গলা মিলে, আহা, কী সুন্দর সুরেই গাইছে। শুনে কাগাইয়ের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগল। গানের সুরটি অতি আশ্চর্য কিন্তু কথা খালি এইটুকু ঃ,

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হীং হ্যায়!

শুনতে শুনতে কানাই একেবারে মেতে গেল, সে ভাবল যে

তারও গানটা না গাইলেই চলছেনা। কাজেই সেও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরল :

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হীং হ্যায়।

এটুকু গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরো উঁচু সুরে গাইল :

'লকুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং সুঁটকি হ্যায়!'

কানাই এই কথাগুলো খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ির ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পৌঁছিয়ে-

ছিল, তাতে আর কোন ভুল নেই। সে গাইয়ে গুলো ছিল অবশ্য ভূত। তারা সেই নূতন কথাগুলো শুনে এতই খুশী হল যে, তখনই ছুটে কানাইয়ের কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে সেই বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল, আর আদরটা যে করল! মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল,

তার অন্ত নেই। তারপর সকলে মিলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল ঃ

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হীং হ্যায়।
লকুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং সুঁটকি হ্যায়।'

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হল। তখন হঠাৎ তার মনে হল, 'কী আশ্চর্য, আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারিনা, আমি আবার নাচলুম কী করে?' বলতে বলতেই তার হাতখানি পিঠের দিকে গেল একী? তার সে কুঁজ যে আর নেই! একজন ভূত বলল, 'কী, দেখছিস বাপ? ওটা আর ওখানে নেই, ঐ দেখ, তোর পাশে পড়ে আছে!'

সত্যি সত্যি সে কুঁজ আর কানাইয়ের পিঠে ছিল না, সেটা তার পাশে পড়ে ছিল। আহা! কানাইয়ের তখন কী আনন্দই হল! আর হালকা আর আরাম বোধ হল এমনি, যে সে তখনই সেইখানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল যে সেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে; ভূতেরা তাকে একটি চমৎকার নতুন পোশাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে গিয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে মনের সুখে বাড়ি চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, এ কথা তাদের বোঝাতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইয়ের কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। যে শুনল, সেই ভাবল যে এমন আশ্চর্য কথা আর কখনও শোনে নি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না; তারা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ির লোককে তার এই আশ্চর্য খবর শোনাবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোকে শুধু সেই গল্প শোনবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে সে বড়লোক হয়ে গেল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। তারপর একদিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ি সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগা, কেবলহাটি যাব কোন্ পথে ?' কানাই বললে, 'এই তো কেবলহাটি ; তুমি কী চাও ?' বুড়ি বলল, 'তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে, ভূতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। তার মন্তরটা তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারলে আমাদের মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।'

কানাই বলল, 'আমিই তো সেই কানাই, ভূতেরা আমারই কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। এর তো মন্তর-টন্তর কিছু নেই, তারা রাত জেগে গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে শুয়ে তাদের গানে নতুন কথা জুড়ে দিয়েছিলাম ; তাইতে তারা খুশী হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে নতুন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল।' বুড়ি তখন খুঁটে খুঁটে কানাইয়ের কাছে থেকে জেনে নিয়ে, তাকে অনেকে আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ির ছেলে যে মানিক তার পিঠে ছিল কানাইয়ের কুঁজের চেয়েও ঢের বড় একটা কুঁজ। লোকটা এমনি দুষ্টু আর হিংসুটে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মানিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ির লোকেরা একদিন রাত্রে তাকে গাড়ি করে এনে ভূতের বাড়ির কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মানিক ভাবছে ভূতেরা ক খ গ গান ধরবে, আর তাতে সে কথা জুড়ে দেবে, আর তার কুঁজ সেরে যাবে। তারপর যেই ভূতেরা বলেছে : 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইমলি হ্যায়,' অমনি মানিক আর তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচাগোল্লা হ্যায়।'

তখন গানের তাল ভেঙে তো গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এসব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারেনা। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিঁচুতে খিঁচুতে এসে বলল, 'কে রে তুই, অসভ্য

বেতালা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি ? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি !' এই বলে তারা কানাইয়ের সেই কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের উপরে বসিয়ে এমনি করে জুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তুলবার জো নেই।

পরদিন মানিকের বাড়ির লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্য খুবই আশ্চর্য আর দুঃখিত হল কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল, 'বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।'

তিনটি বর

এক দেশে এক কামার ছিল, তার মতো অভাগা আর কোনো দেশে কখনো জন্মায় নি। তাকে এক জিনিস গড়তে দিলে তার জায়গায় আর-এক জিনিস গড়ে রাখত; একটা কিছু সারাতে দিলে তাকে ভেঙ্গে আরো খোঁড়া করে দিত। আর লোককে ফাঁকি যে দিত, সে কী বলব! কাজেই কেউ তাকে কোনো কাজ করতে দিতে চাইত না, তার দুবেলা দুটি ভাতও জুটত না; লাভের মধ্যে সে তার গিন্নীর তাড়া খেয়ে সারা হত।

একদিন সে দোকানে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ভয়ানক শীত; গায়ে জড়াবার কিচ্ছু নেই। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে; ঘরে খাবার নেই। এমন সময় কোত্থেকে এক এই লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জয় হোক বাবা, দুঃখী বুড়োকে কিছু খেতে দাও।'

কামার বলল, 'বাবা, খাবার যদি থাকত, তবে নিজেই দুটি খেয়ে বাঁচতুম। দুদিন পেটে কিছু পড়ে নি, ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করেছি,—তোমাকে কোত্থেকে দেব? তুমি নাহয় ঘরে এসে একটু গরম হয়ে যাও, আমি হাপর ঠেলে আগুনটা উসকিয়ে দিচ্ছি।'

বুড়ো তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে বলল, 'আহা, বাঁচালে বাবা; শীতে জমে গিয়েছিলুম। তুমি দেখছি তবে আমার চেয়েও দুঃখী। আমার নিজে খেতে পেলেই চলে, তোমার আবার স্ত্রী আর ছেলেপুলেও আছে।'

এই বলে বুড়ো আগুনের কাছে এসে বসল, কামার খুব করে হাপর ঠেলে আগুন উসকিয়ে তাকে গরম করে দিল। যাবার সময় বুড়ো তাকে বলল, 'তুমি আমাকে খেতে দিতে পার নি, তবু তোমার যতদূর সাধ্য তুমি করেছ। এখন তোমার যেমন ইচ্ছা, তিনটি বর চাও, আমি নিশ্চয় দেব।'

এ কথায় কামার অনেকক্ষণ বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগল, কিন্তু কী বর চাইতে হবে, বুঝতে পারল না। বুড়ো বলল, 'শিগ্‌গির বলো; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি—ঢের কাজ আছে।'

তখন কামার থতমত খেয়ে বলল, 'আচ্ছা, তবে এই বর দিন যে, আমার হাতুড়িটি যে একবার হাতে করবে, সে আর আমার হুকুম ছাড়া সেটি রেখে দিতে পারবে না। আর যদি তা দিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে, তবে আমি থামতে না বললে আর থামতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে। আর কী বর চাই?'

কামার বলল, 'আমার এই কেদারাখানিতে যে বসবে, সে আমার হুকুম ছাড়া তা থেকে উঠতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তাও হবে। আর কী?'

কামার বলল, 'আমার এই থলিটির ভিতরে আমি কোনো টাকা রাখলে আমি ছাড়া আর কেউ তাকে তা থেকে বার করতে পারবে না।'

সেই বুড়ো ছিলেন এক দেবতা। তিনি এই শেষ বরটিও সেই কামারকে দিয়ে ভয়ানক রেগে বললেন, 'অভাগা, তুই ইচ্ছা করলে এই তিন বরে পরিবারসুদ্ধ স্বর্গে চলে যেতে পারতিস, তার মধ্যে তোর এই দুর্মতি!'

এই বলে দেবতা চলে গেলেন, কামার বসে বসে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল যে, তাই তো, এই তিন বরের জোরে তো আমি বেশ দু পয়সা রোজগার করে নিতে পারি।

তখন সে দেশময় এই কথা রটিয়ে দিল যে, 'আমার দোকানে এলে আমি বিনি পয়সায় কাজ করে দেব।' দেশের যত কিপটে পয়সা-ওয়ালা লোক সে কথা শুনে তার দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগল। এক-একজন আসে, আর কামার তাকে দু হাতে লম্বা লম্বা সেলাম করে তার সেই কেদারাখানায় নিয়ে বসতে দেয়। বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে চলে যাবার সময় আর সে বেচারা তা থেকে

উঠতে পারে না, কামারও বেশ ভালমতে তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না ক'রে উঠতে দেয় না। এমনি করে দিনকতক সে খুব টাকা পেতে লাগল। কাউকে এনে চেয়ারে বসায়, কারু হাতে তার হাতুড়িখানা তুলে দেয়, তারপর টাকা না দিলে আর তাকে ছাড়ে না।

যা হোক, ক্রমে সকলেই তার দুষ্টুমি টের পেয়ে ফেলল ; তখন আর কেউ তার কাছে আসে না, কাজেই আবার তার দুর্দশার একশেষ হতে লাগল। এই সময় কামার একটা বনের ভিতর বেড়াতে গিয়ে একটি সাদাসিদে গোছের বুড়োকে দেখতে পেল। বুড়োকে দেখে সে আগে ভাবল, বুঝি কোনো উকিল হবে। কিন্তু তখনই আবার কোনো উকিলের সেই বনের ভিতর আসা তার ভারি অসম্ভব মনে হল। তারপর সে আবার ভাল করে চেয়ে দেখল যে সেই লোকটার পা দুখানিতে ঠিক ছাগলের পায়ের মতো খুর আছে তখন আর তার বুঝতে বাকি রইল না। যে সেই বুড়ো আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। শয়তানের পা ঠিক্ ছাগলের মতো থাকে, এ কথা সেই কামার ছেলে-বেলা থেকে শুনে আসছিল।

আর কেউ হলে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাত। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না করে জোড় হাতে শয়তানকে নমস্কার করে বলল, 'প্রণাম হই।'

শয়তান অমনি হাসতে হাসতে তার নাম ধরে বলল, 'কী হে, কেমন আছ?'

কামার বলল, 'আজ্ঞে কেমন আর থাকব? দুবেলা দুটি ভাতও খেতে পাই নে।'

শয়তান বলল, 'বটে! তুমি এতই কষ্ট পাচ্ছ? তুমি কেন আমার চাকরি করো না, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব!'

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনই শয়তানের কথায় রাজী হল, যদিও সে জানত যে তার কাজে একবার ঢুকলে আর কেউ ছেড়ে আসতে পারে না। শয়তান তখন তাকে তিন থলি মোহর দিয়ে বলল, 'এখন গিয়ে এই টাকা দিয়ে খুব আরামে খাও-দাও;

সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসব, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' এই বলে শয়তান চলে গেল। কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফিরল।

সেই তিন থলি মোহর নিয়ে কামার যারপরনাই খুশী হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি এল। ভাবল, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধুমধাম করে নেবে। সাত বছর পরে শয়তানের তাকে নিতে আসবার কথা, তখন তার সঙ্গে যেতেই হবে।

তারপর লোকে দেখল যে কামার কেমন করে রাতারাতি বড়-লোক হয়ে গেছে। এখন আর সে হাপরও ঠেলে না, লোহাও পেটে না; এখন তার গাড়ি ঘোড়া চাকরবাকরের অন্ত নেই। দিন যাচ্ছে আর তার বাবুগিরি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সে বাবুগিরিতে সাত বছর শেষ হবার ঢের আগেই শয়তানের দেওয়া সব টাকা ফুরিয়ে গেল, আর ঘরে একটি পয়সাও নেই, একমুঠো চালও নেই। তখন কাজেই তাকে আবার যে কামার সেই কামারই হতে হল, নইলে খাবে কী?

তারপর একদিন সে তার দোকানে বসে একটা লোহা পিটছে আর ভাবছে, কখন খদ্দের আসবে, এমন সময় একজন বুড়ো-হেন লোক ধীরে ধীরে এসে তার কাছে দাঁড়াল। কামার আগে ভাবল, 'এইরে, খদ্দের!' তারপর চেয়ে দেখল 'ওমা! এয়ে শয়তান!'

শয়তান বলল, 'মনে আছে তো? সাত বছর শেষ হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চলো।'

কামার বলল, 'তাই তো, আমি গেলে আমার ছেলেপুলেগুলো কী খাবে? তোমার তো কতই লোক আছে, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও।'

শয়তান বলল, 'সে হবে না! আমাকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত কাজ; চলো, এখনই চলো।'

কামার বলল, 'তুমি ছাড়বেই না যখন তখন তো চলতেই হবে, কিন্তু আমার হাতের এই কাজই শেষ করে যেতে পারলে আমার

ছেলেগুলোর পক্ষে বড় ভাল হত—এর দরুন কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি দাদা আমার এই উপকারটুকু করো না—আমি সকলের কাছে বিদায় হয়ে নিই, ততক্ষণ তুমি বসে এই হাতুড়িটা দিয়ে এই লোহাখানিকে পেটো।'

শয়তান কাজে এমন দুষ্টু হলেও কথাবার্তায় ভারি ভদ্রলোক, সে কামারের কথা শুনে তখনই তার হাত থেকে হাতুড়িটি নিয়ে লোহাটাকে পেটাতে লাগল। সে জানত না যে সেটা সেই দেবতার বর দেওয়া সর্বনেশে হাতুড়ি, তা দিয়ে একবার পিটতে আরম্ভ করলে আর কামারের হুকুম ছাড়া থামবার উপায় নেই। কামার তার হাতে সেই হাতুড়ি দিয়েই অমনি যে ঘর থেকে বেরুল, আর এক মাসের ভিতরে সেই মুখোই হল না।

একমাস পরে কামার দোকানে ফিরে এসে দেখল যে শয়তান তখনও ঠনাঠন ঠনাঠন করে বেদম হাতুড়ি পিটছে, আর তার দশা যে হয়েছে! খালি শয়তান বলে সে এতক্ষণ বেঁচে আছে, আর কেউ হলে মরেই যেত। কামারকে দেখে সে অনেক মিনতি করে বলল, 'ভাই, ঢের তো হয়েছে; আমাকে মেরে ফেলে তোমার লাভ কি? তার চেয়ে তোমাকে আরও তিন থলি মোহর দিচ্ছি, আরও সাত বছরের ছুটি দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কামার ভাবল, মন্দ কি। আর তিন থলি মোহর দিয়ে সাত বছর সুখে কাটানো যাক। কাজেই সে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে তাই হোক।'

তখন শয়তান কামারকে আবার তিন থলি মোহর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল, কামারও সেই টাকা দিয়ে আবার ধুমধাম জুড়ে দিল। তারপর সে টাকা শেষ হতেও আর বেশি দেরি হল না, তখন আর হাতুড়ি-পেটা ভিন্ন উপায় নেই। এমনি করে আবার সাত বছর কেটে গেল।

এবার শয়তান কামারকে নিতে এসে দেখে তার বাড়িতে ভারি গোলমাল। কি কথা নিয়ে কামার তার গিন্নীর উপর বিষম চটেছে,

আর তাকে ধরে ভয়ানক মারছে। কামারের গিন্নীও যেমন-তেমন মেয়ে নয়, পাড়ার সকলে তার জ্বালায় অস্থির থাকে। কামারকে সে ঝাঁটা দিয়ে কম নাকাল করছে না, কিন্তু কামারের হাতে কিনা হাতুড়ি, কাজেই জিত হচ্ছে তারই। শয়তান এসে এসব দেখে কামারকে ভয়ানক দুই থাপড় লাগিয়ে বলল, 'বেটা পাজি, স্ত্রীকে ধরে মারিস? চল্, আমার সঙ্গে চল্।'

শয়তান ভেবেছিল, এতে কামারের স্ত্রী খুব খুশী হয়ে তার সাহায্য করবে। কিন্তু কামারের স্ত্রী তার কিছু না করে, 'বটে রে হতভাগা তোর এতবড় আস্পর্ধা! আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলছিস!' বলে, সেই ঝাঁটা দিয়ে শয়তানের নাকে মুখে এমনি সপাংসপ মারতে লাগল যে বেচারার দমই ফেলা দায়। সে তাতে বেজায় থতমত খেয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল—সেই চেয়ার, যাতে একবার বসলে আর বিনা হুকুমে ওঠবার জো নেই।

কামার দেখল যে শয়তান এবারে বেশ ভালমতেই ধরা পড়েছে, হাজার টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আচ্ছা করে তার নাকটা টিপে ধরল। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে 'হেঁইয়া' বলে সেই চিমটে ধরে টানতেই নাকটা রবারের মতো লম্বা হতে লাগল। এক হাত, দু হাত, চার হাত, আট হাত—নাক যতই লম্বা হচ্ছে, শয়তান বেটা ততই ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হল তখন শয়তান আর থাকতে না পেরে নাকিসুরে বলল, 'দোহাই দাদা! আর টেনো না, মরে যাব।'

কামার বলল, 'আরও তিন থলি টাকা, আর সাত বছরের ছুটি—দেবে কিনা বলো।' শয়তান ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এক্ষুনি, এক্ষুনি, এই নাও।' বলতে বলতেই তিন থলি ঝকঝকে মোহর এসে কামারের কাছে হাজির হল; কামার সেগুলো সিন্দুকে তুলে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে যাও।' শয়তান ছাড়া পেয়েই সেখান থেকে এমনি ছুট দিল যে ছুট যাকে বলে!

তখন কামার আর তার স্ত্রী মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে হাসিটা যে হাসল! আর সাত বছরের জন্য তাদের কোনো ভাবনা রইল না। সাত বছর যখন শেষ হল, তখন কামারের টাকাও ফুরিয়ে গেল, তাকে আবার তার ব্যবসা ধরতে হল, ততদিন শয়তানও আবার তাকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হল।
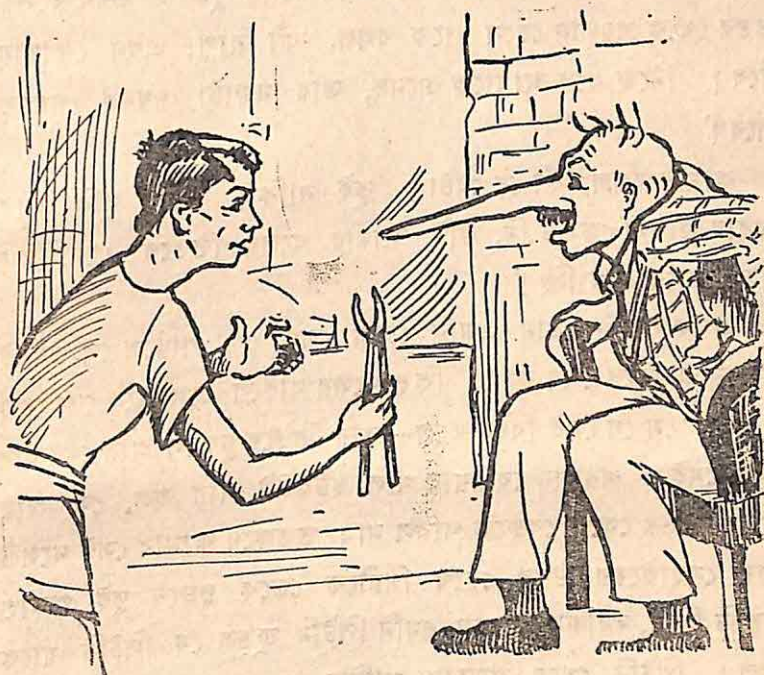
সাত বছর পরে শয়তান আবার কামারকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু গত বারে সে নাকে যে চিমটি খেয়ে গিয়েছিল, তার কথা ভেবে আর সে সোজাসুজি কামারের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এবারে সে ভারি এক ফন্দি এঁটে এসেছে।

শয়তান জানে যে, কেউ যদি তাকে নিজে থেকে আদর করে নিয়ে যায় তাহলে আর সে কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারে না। তখন শয়তান করল কি, একটি ঝকঝকে মোহর হয়ে ঠিক কামারের

দোকানের সামনে রাস্তায় গিয়ে পড়ে রইল। সে ভাবল যে কামার খেতে পায় না, মোহরটি দেখলে সে পরম আদরে তাকে এসে তুলে নিয়ে যাবে ; তারপর আর সে শয়তানকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায় ?

যে কথা সেই কাজ। কামার সেই মোহরটিকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ছুটে গিয়ে সেটিকে তুলে এনে তার থলেয় পুরল। তখন থলের ভিতর থেকে শয়তান হেসে তাকে বলল, 'কী বাপু, এখন কোথায় যাবে ? নিজে ধরে আমাকে এনেছ, তার মজাটা এখনই দেখতে পাবে !'

কামার বলল, 'কী রে বেটা ? তুই নাকি ! তোর বুঝি আর মরবার জায়গা জোটে নি, তাই আমার থলের ভিতরে এসেছিস ? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি !'

এ কথায় শয়তান এমনি রেগে গেল যে, পারলে সে তখনই কামারকে মেরে শেষ করে। কিন্তু থলের বাইরে এলে তবে তো শেষ করবে ! সে যে সেই বিষম থলে—তার ভিতরে ঢুকলে আর বেরুবার হুকুম নেই ! শয়তান বেচারার খলি ছটফটই সার হল, সে আর থলের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে কামার সেই থলেটি তার নেহাইয়ের উপর রেখে গিন্নীকে ডেকে দুজনে দুই প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে, দমাদ্দম দমাদ্দম এমনি পিটুনি জুড়ল যে পিটুনি যাকে বলে ! পিটুনি খেয়ে শয়তান খানিক খুব চেঁচাল। তারপর যখন আর চেঁচানি আসে না, তখন গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'ছেড়ে দাও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। এবার তোমাকে বিশাল বিশাল ছয় থলে ভরা মোহর দেব, আর—আর কখনো তোমার কাছে আসব না।'

একথায় কামারের গিন্নী বলল, 'ওগো, সে হলে নেহাত মন্দ হবে না ; দাও হতভাগাকে ছেড়ে !' তখন কামার বলল, 'কই তোর মোহরের থলে ?' বলতে বলতেই এমনি বড় বড় মোহরের থলে এসে হাজির হল যে তারা দুজনে মিলেও তার একটাকে তুলতে

বলল, 'যা পারে না। তখন কামার একগাল হেসে, তার থলের মুখ খুলে দিয়ে বেটা! ফের তোর পোড়া মুখ এখানে দেখাতে আসবি তো টের পাবি।' ততক্ষণে শয়তান থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল যে কামারের সব-কথা শুনতেও পেল না।

সেই ছটি থলের ভিতর এতই মোহর ছিল যে, কামার হাজার ধুমধাম করেও তা শেষ করতে পারল না। চার থলে ভাল করে ফুরুতে না ফুরুতেই সে বুড়ো হয়ে শেষে একদিন মরে গেল। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সে ভাবল যে এখন তো হয় স্বর্গে না হয় নরকে দুটোর একটায় যেতে হবে। আগে স্বর্গের দিকে গিয়েই দেখি না, যদি কোনোমতে সেখানে ঢুকতে পারি।

স্বর্গের ফটকের সামনে গিয়ে তার সেই দেবতাটির সঙ্গে দেখা হল, যিনি তাকে সেই তিনটি বর দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কামার ভারী খুশী হয়ে ভাবল, 'এই ঠাকুরটি না আমাকে সেই চমৎকার বরগুলো দিয়াছিলেন? ইনি অবিশ্যি আমাকে ঢুকতে দেবেন।'

কিন্তু দেবতা তাকে দেখেই যারপরনাই রেগে বললেন, 'এখানে এসেছিস কী করতে? পালা হতভাগা, শিগগির পালা!'

কাজেই তখন বেচারা আর কী করে? সে সেখান থেকে ফিরে নরকের দিকে চলল। সেখানকার ফটকের সামনে উপস্থিত হলে শয়তানের দারোয়ানেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম?'

কামার তার নাম বলতেই পাঁচ-ছয়টা দারোয়ান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে শয়তানকে বলল, 'মহারাজ! সেই কামার এসেছে!' তা শুনে শয়তান বিষম চমকে গিয়ে একটা লাফ যে দিল! তারপর পাগলের মতো ফটকের কাছে ছুটে এসে দারোয়ানদের বলল, 'শিগ্‌গির দরজা বন্ধ কর! আঁট্‌ হুড়কো! লাগা তালা! খবরদার! ও বেটাকে ঢুকতে দিবি না! ও এলে আর কি আমাদের রক্ষা থাকবে!'

শয়তানের গলা শুনে কামার গরাদের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে হাসতে বলল, 'কী দাদা! কী খবর?' সে কথা শেষ না

হতেই শয়তান এক লাফে এসে এমনি তার নাক মলে দিল যে কী বলব! কামার তখনই সেখান থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে পালাল, কিন্তু তার আগেই তার নাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে আগুন আজও নেবে নি। কামার তার জ্বালায় অস্থির হয়ে জলায় জলায় নাক ডুবিয়ে বেড়ায়। লোকে সেই আগুন দেখতে পেলে বলে, 'ঐ আলেয়া।'

লাল সুতো আর নীল সুতো

এক জোলা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'আমি পায়েস খাব, পায়েস রেঁধে দাও।' জোলার স্ত্রী বলিল, 'ঘরে কাঠ নেই, কাঠ এনে দাও, পায়েস রেঁধে দিচ্ছি।' জোলা কাঠ আনিতে গেল।

পথের ধারে একটা বড় আম গাছ ছিল, তাহার একটা শুক্‌নো ডালের আগায় বসিয়া জোলা তাহারই গোড়ার দিকটা কাটিতেছে। তাহা দেখিয়া পথের লোক একজন ডাকিয়া বলিল, 'ওহে ও ডাল কেটো না, কাটলে পড়ে যাবে।' জোলা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তুমি গুনতে জানো নাকি? ও ডাল কাটলে প'ড়ে যাব, তা তুমি কী ক'রে জানলে? আমি পায়েস খাব না বুঝি!' পথের লোক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আর, খানিক পরে জোলাও ডালসুদ্ধ পড়িয়া গেল।

গাছ হইতে পড়িয়াই জোলা ভাবিল, 'তাই তো! আমি যে প'ড়ে যাব, তা ও জানলে কী ক'রে? ও নিশ্চয় একটা কেউ হবে।' এই ভাবিয়া জোলা ছুটিয়া গিয়া সেই পথিকের পা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, আপনি কে? আমি কবে মরব, সেটি আমাকে ব'লে দিন।' পথিক ভারি মুশকিলেই পড়িল। জোলার খুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ পথিক সামান্য পথিক নয়; সুতরাং তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না! শেষটা পথিক যখন দেখিল যে, একটা কিছু না বলিলে তাহার আর ঘরে যাওয়া হইতেছে না, তখন সে রাগিয়া বলিল, 'তোর পেটের ভিতর থেকে লাল সুতো আর নীল সুতো যখন বেরুবে, তখন তুই মরবি।' এই কথায় জোলা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ি ফিরিল।

এখন হইতে জোলা ঠিক হইয়া বসিয়া আছে যে, লাল সূতা আর নীল সূতা বাহির হইলেই তাহার মৃত্যু। সুতরাং সে রোজ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা বাহির হইল কি না। এইরূপ পরীক্ষা

করিতে গিয়া একদিন সত্য সত্যই তাহার কাপড়ে একখণ্ড লাল সূতা আর একখণ্ড নীল সূতা পাইল। আর অমনি সে চীৎকার করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'ওগো শিগ্‌গির এস, আমি মরে গিয়েছি—আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে।' তাহার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই লাল সূতা আর নীল সূতা। তখন সে বেচারা কী করে, জোলাকে বিছানায় শোয়াইয়া কাপড় চাপা দিয়া সে কাঁদিতে বসিল। এর মধ্যে আর দু-চারজন জোলা বেড়াইতে আসিয়া দেখে যে, জোলার স্ত্রী কাঁদিতেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, লাল সূতা নীল সূতা পাওয়া গিয়াছে, তখন সকলে স্থির করিল যে, জোলা নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার সৎকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে ভারি মুশকিল দেখা দিল। পোড়ানোতে জোলা কিছুতেই রাজী নয়। পোড়ানোর কথা তুলিতেই সে বলে, 'ওমা! পুড়ে যাব যে!' মরিয়া গেলে তাহাকে পোড়ানো ছাড়া আর কী করা যায়?—গোর দেওয়া! কিন্তু জোলা তাহাতেও অসম্মত। বলে, 'ওমা! দম আট্‌কে যাবে যে!' শেষে অনেক যুক্তির পর স্থির হইল যে, জোলাকে গোর দেওয়াই হইবে, কিন্তু মুখখানা জাগাইয়া রাখা যাইবে। জোলা তাহাতে রাজী হইল; কিন্তু সে বলিল যে, 'খিদে পেলে চারটি ভাত দিয়ো।' এইরূপ পরামর্শের পর জোলাকে গোর দেওয়া হইল—অর্থাৎ তাহার মুখ জাগিয়া রহিল, আর সব মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিল।

এইরূপে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে চারটি ভাত খাইয়া জোলা একটু নিদ্রার চেষ্টা দেখিল।

সেই রাত্রিতে সাত চোর রাজার বাড়িতে চুরি করিতে চলিয়াছে। চোরেরা তো আর বাবুদের মতন সদর রাস্তা দিয়ে চলে না—তাহারা প্রায়ই ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়া চলে, আর সে-সব জায়গা অনেক সময়ই নোংরা থাকে। চলিতে চলিতে একজন চোর কাদার মতন একটা কী জিনিস মাড়াইল, সে জিনিসটার বিশ্রী গন্ধ। সে পা

মুছিবার জন্য একটা জায়গা খুঁজিতে লাগিল। উহার নিকটেই জোলাকে গোর দিয়াছে, সে চোর পা মুছিবি তো মোছ, সেই জোলার মুখে গিয়া মুছিতে লাগিল! ঘষার আর গন্ধের চোটে জোলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; সে রাগিয়া বলিল, 'উঃ—হুঁঃ—হুঁঃ—! তোমার কি চোখ নাই না কি ?'

চোর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কে রে ?'

জোলা বলিল, 'আমি জোলা।'

'এখানে কী করছিস ?'

'আমি যে ম'রে গিয়েছি ; আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে—তাই আমাকে গোর দিয়েছে !'

এই কথা শুনিয়া চোরেরা খুব হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন বলিল, 'একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।'

চোরেরা জোলাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, আর তাহাদের সঙ্গে গেলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে। জোলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কী খাওয়াবে ? পায়েস ?' চোরেরা বলিল, 'হাঁ পায়েস— চল্ !' পায়েসের কথা শুনিয়া জোলা কোন আপত্তি করিল না। চোরেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিল।

রাজার বাড়িতে গিয়া চোরেরা রাজার ঘরে প্রকাণ্ড সিঁদ কাটিল। তারপর জোলাকে ঐ সিঁদের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, 'রাজার মাথার মুকুটটা নিয়ে আয়।' রাজার খাটে মশারি খাটানো ছিল, তাহা দেখিয়া জোলা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মশারির চারিদিক ঘুরিয়া কোথাও তাহার দরজা দেখিতে পাইল না ; সুতরাং চোরেদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হল না ; ওর ভিতরে আর একটা ঘর আছে, তার দরজা নেই।'

চোরেরা বলিল, 'দূর বোকা ! ওটা ঘর নয়, মশারি। ওটাকে তুলে দেখলি না কেন ?' জোলা আবার ঘরের ভিতরে গেল।

এবার জোলা মশারি তুলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সেটাকে নাড়িতেও পারিল না—কারণ সে খাটসুদ্ধ ধরিয়া টানাটানি

করিয়াছিল। সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না ভাই, ওটা বড্ড ভারী।'

'আরে এমন গাধাও আর দেখিনি! তুই বুঝি খাটসুদ্ধ তুলতে গিয়েছিলি? শুধু ওর কাপড়টা টানতে হয়।'

এবারে জোলা আর কোন ভুল করিল না। মশারির কাপড় ধরিয়া টানিতেই সেটা উঠিয়া আসিল। ভিতরে খুব উঁচু গদির উপরে

রাজা শুইয়া আছেন, তাঁহার গায় ঝালর দেওয়া অতিশয় পুরু লেপ। দেখিয়া জোলার মনে ভারি দুঃখ হইল। সে ভাবিল, বুঝি রাজাকে গোর দিয়াছে। তারপর দেখিল, মুখখানি জাগিতেছে। তখন সে ভাবিল যে, 'ঠিক তো আমারই মতন করেছে দেখছি! এরও লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছিল নাকি?' জোলা যত ভাবে, ততই আশ্চর্য হয়, আর ততই তাহার জানিতে ইচ্ছা করে, রাজা মহাশয়েরও লাল সূতা নীল সূতা বাহির হইয়াছিল কি না, শেষটা এমন হইল যে, এই খবরটা তাহার না জানিলেই নয়। সুতরাং সে রাজাকে ঠেলিয়া

জাগাইল। আর, তিনি চোখ মেলিবামাত্রই, জিজ্ঞাসা করিল : 'লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছিল ?'

ইহার পর একটা মস্ত গোলমাল হইল। রাজবাড়ির সকলে জাগিয়া গেল, সাত চোর ধরা পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জেলাও ধরা পড়িল।

পরদিন বিচার। জোলা আগাগোড়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। লাল সুতো নীল সুতোর কথা, গোর দিবার কথা, চোরের পা মুছিবার কথা, পায়েসের কথা—কিছুই বাকি রাখিল না।

বিচারে সাত চোরের উচিত সাজা হইল। আর জোলাকে পেট ভরিয়া উত্তম উত্তম পায়েস খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

ভুতো আর ঘোঁতো

ভুতো ছিল বেঁটে আর ঘোঁতো ছিল ঢ্যাঙা ; ভুতো ছিল শেয়ানা, আর ঘোঁতো ছিল বোকা। দুজনে মিলে গেল কুলগাছ থেকে কুল পাড়তে। ঘোঁতো কিনা ঢ্যাঙা, সে দু হাতে খালি কুলই পাড়ছে। ভুতো কিনা বেঁটে, তাই সে কুল নাগলে পায় না, সে শুধু ঘোঁতোর পাড়া কুল খাচ্ছে।

কুল পাড়া হয়ে গেলে ঘোঁতা বলল, 'কুলই কই রে ?' ভুতো বলল, 'নেই। খেয়ে ফেলেছি।' ঘোঁতো বলল, 'বটে রে ? তবে দাঁড়া লাঠি আনছি।'

বলেই অমনি ঘোঁতো গেল গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল —একটাও রাখল না ?

গাছ বলল, 'এই যে ঘোঁতো। কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' গাছ বলল, 'আমাকে কাটবে ? কী দিয়ে কাটবে ? কুড়ুল কই ?'

ঘোঁতো গেল কুড়ুল আনতে। কুড়ুল বলল, 'এই ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'কুড়ুল আনতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' কুড়ুল বলল, 'আমাকে নেবে ? শানাবে কিসে ? পাথর কই ?'

ঘোঁতো গেল পাথর আনতে। পাথর বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'পাথর আনতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল বানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে

ফেলল, একটাও রাখল না ?' পাথর বলল, 'আমাকে নেবে ? ভেজাবে কী দিয়ে ? জল কই ?'

ঘোঁতো গেল জল আনতে। জল বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'জল আনতে, জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' জল বলল, 'আমাকে নেবে ? হরিণ আসবে, আমাতে নামবে, গা ভিজবে, তবে তো হবে।'

ঘোঁতো গেল হরিণের কাছে। হরিণ বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'হরিণ আনতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল বানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' হরিণ বলল, 'আমাকে নেবে ? কুকুর কই ? তোমাকে ধরবে কে ?'

ঘোঁতো গেল তাদের কুকুর ভোলাকে ডাকতে। ভোলা বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'ভোলাকে ডাকতে ; ভোলাকে দিয়ে হরিণ ধরাতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল বানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' ভোলা বলল, 'আমাকে নেবে ? তবে মাখন আনো, নখে মাখি।'

ঘোঁতো গেল মাখন আনতে। মাখন বলল, 'এই যে ঘোঁতো ; কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'মাখন আনতে ; ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল

দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' মাখন বলল, 'আমাকে নেবে ? তবে বেড়াল আনো, চেটে তুলুক।'

ঘোঁতো গেল তাদের মেনির কাছে। মেনি বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'মেনিকে খুঁজতে, মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' মেনি বলল, 'আমাকে নেবে ? দুধ দাও তবে, খাই আগে।'

ঘোঁতো গেল গাইয়ের কাছে। গাই বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'গাইয়ের কাছে দুধ আনতে ; মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে, জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' গাই বলল, 'দুধ নেবে ? খড় আনো তবে, খাই আগে !'

ঘোঁতো গেল চাষার কাছে। চাষা বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'চাষার কাছে খড় আনতে ; গাইকে দিয়ে দুধ পেতে ; মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে ; নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রহিল না ? চাষা বলল, 'খড় নেবে ? আটা আনো পিঠে খাব।'

ঘোঁতা গেল মুদীর কাছে। মুদী বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন

আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'মুদির কাছে আটা আনতে, চাষাকে দিয়ে খড় নিতে; খড় নিয়ে গাইকে দিয়ে দুধ পেতে; মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' মুদী বলল, 'নদী থেকে এই চালনি ভরে জল আনো, নইলে আটা পাবে না।'

চালনি নিয়ে খুশী হয়ে ঘোঁতো গেল নদী থেকে জল আনতে। জল তো তাতে থাকে না, তুলতে গেলেই পড়ে যায়। যত তোলে ততই পড়ে। বেলা হল, বেলা গেল, সন্ধ্যা এল; ঘোঁতো তবু খালি চালনি ডোবাচ্ছে আর তুলছে, আর খালি ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। ঘোঁতো বলল, 'কী মুশকিল! এখন কী হবে?'

সেখানে কতকগুলো হাঁস ছিল, তারা প্যাঁক প্যাঁক করে

ডাকছিল। তা শুনে ঘোঁতো বলল, 'আরে তাই তো, ঠিক তো বলেছে। চালনিতে পাঁক মাখিয়ে নিতে হবে, তাহলেই ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে আর জল ধরবে।' নদীর ধারে পাঁক ছিল, ঘোঁতো তাই নিয়ে চালনিতে মাখলে; ফুটো বন্ধ হয়ে গেল, আর জল পড়তে পেল না। ঘোঁতো তখন হাসতে হাসতে জল নিয়ে মুদীর কাছে ফিরে এল। মুদী তাতে খুশী হয়ে ঘোঁতোকে ঢের আটা দিল। আটা নিয়ে ঘোঁতো গেল চাষার কাছে; চাষা তাতে খুশী হয়ে ঘোঁতোকে খড় দিল। খড় নিয়ে ঘোঁতো দিল গাইকে; গাই তা খেয়ে খুশী হয়ে ঢের দুধ দিল। দুধ নিয়ে ঘোঁতো দিল মেনিকে; মেনি তা খেয়ে খুশী হয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিল। ভোলা সে মাখন নখে মেখে হরিণ ধরে আনল। হরিণ গিয়ে জলে নেমে গা ভিজিয়ে এল। ঘোঁতো তার গা থেকে জল নিয়ে পাথরে দিল, সেই পাথরে কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটল, সেই গাছ দিয়ে লাঠি বানাল, সেই লাঠি নিয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে ছুটে গেল কুল গাছ তলায় ভূতোকে মারতে। ভূতো কি ততক্ষণ গাছতলায় বসে? সে তার কত আগেই ছুটে পালিয়েছে।